মে-জুন ২০১০ ❐ একাদশ বর্ষ ❐ তৃতীয় সংখ্যা ❐ ৬ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়
বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন পৃষ্ঠা ৩

চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠা ১২

চীনের গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৃষ্ঠা ১৮

হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল
ঊ হানের নাটক নিয়ে নাটক পৃষ্ঠা ২১

চীন নিয়ে আড্ডা পৃষ্ঠা ২৩

চিঠিপত্র :
১. বিষয় : জোরজারি থেকে ক্ষমতার বৃত্তে পৃষ্ঠা ২
২. বিষয় : ফলতা এসইজেড পৃষ্ঠা ২৫
৩. বিষয় : জোরজারির প্রতিরোধ পৃষ্ঠা ২৫

চীন : অতীত থেকে সমকালে

পত্রিকার এবছরের জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা চীনের অতীত, মূলত চীনবিপ্লবের সময় থেকে, আলোচনা শুরু করেছিলাম। এবারের সংখ্যায় আমরা তার সমকালের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে চাইছি। কিন্তু আর একবার বলা দরকার, কেন এখন চীন নিয়ে আলোচনা করছি?

চীন প্রতীক আকারে এখনও আমাদের এক 'বামপন্থী' বিবেক। যে 'বামপন্থা' সরকার চালায়, যে 'বামপন্থা' জনযুদ্ধ করে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিতে চায়, যে 'বামপন্থা' এদেশের — বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে — শিক্ষিত নয়াকুলীন (এলিট) সমাজমনের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেই সকল বামপন্থার এক আগাপাস্তালা বিচার (ক্রিটিক) নানান দিক থেকেই জরুরি হয়ে পড়েছে। এই বিচারের কাজটা চীনের দিক থেকেও করা যেতে পারে। এখনও ভারত–নেপাল–বাংলাদেশ–চীনে 'মাওবাদী' দল, গোষ্ঠী, সর্বোপরি ভাবনার অস্তিত্ব রয়েছে। সেদিক থেকেও চীন নিয়ে সংলাপ প্রাসঙ্গিক।

চীন নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন মানুষের সঙ্গে, যাঁরা সম্প্রতি এদেশ থেকে চীনে গেছেন —— স্বপ্না গুহ ব্যানার্জি, প্রবাল দাশগুপ্ত, ব্যাসদেব দাশগুপ্ত, বর্ণালী চন্দ; বিদেশে চীন নিয়ে গবেষণা করেন এমন একজনের সঙ্গেও আমরা খানিকটা আলাপ চালিয়েছি — রবার্ট ওয়েল। বই বা পত্রপত্রিকা থেকে কোন বিষয়কে বোঝার যেমন সীমাবদ্ধতা থাকে, বাইরে থেকে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ভাষার কোন দেশে অল্প সময়ের জন্য গিয়ে সেখানকার সমাজ ও ইতিহাসকে বোঝাও বেশ মুশকিল। তবু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চীন সম্পর্কে ভালোমন্দ ধারণার প্রচলিত মোহজাল ভেদ করে এক বাস্তবনিষ্ঠ উপলব্ধিতে আমরা পৌঁছাতে চাইছি।

সম্ভবত আরও একটি সংখ্যাতে আমাদের এই আলোচনা চলবে।

১. বিষয় : জোরজারি থেকে ক্ষমতার বৃত্তে

প্রীতিভাজনেষু —

জিতেন, সরাসরি জোরজারির কথাটায় চলে আসা যাক। যা নিয়ে বেশ কিছুদিন নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে তার মধ্যে এই জোরজারির কথাটাই থেকে যাচ্ছে। আমার তো তাই মনে হয়। হিংসা–অহিংসা বা লক্ষ্য ও পন্থা ইত্যাদির ভাষায় সাজালে মনে হতে পারে বড্ড ভারী ভারী কথা হয়ে যাচ্ছে। আমার ইদানীং মনে হয় কথাগুলোও আসলে দৈনন্দিনের আর তা আলোচনাও করা দরকার বেশ দৈনন্দিনের ভাষায়। দ্যাখো, জোরজারের কথাটা ওঠে কোথায়। যেখানে কোনো কাজ তোমার নিজের ইচ্ছেয় করতে মন চায় না সেখানেই তো। তা তোমার নিজের ইচ্ছেয় করতে যে মন চাইছে না তার একটা কোনো কারণ আছে নিশ্চয়। তোমার নিজের দিককার কোনো কারণের কথাই বলছি। আলোচনায় সে কারণের কথা তুমি বলতেই পার। আমি যদি তোমার কারণ মেনে নিতে পারি, তাহলে তো মিটে গেল। না হলে আমি পাল্টা কারণ দেখাব কেন তোমার ওই কাজটা করা উচিত। তুমি যদি আমার কথাটা মেনে নিতে পার, তাহলেও মিটে গেল ব্যাপারটা। এতে কাজটা করা বা না–করা দুটোই হচ্ছে সহসম্মতির ভিত্তিতে। আমাদের বেশির ভাগ পরিস্থিতি বা বেশির ভাগ সমস্যা যদি এই ধাঁচে ফেলা যেত তাহলে অর্ধেক সমস্যা মিটেই যেত। সহসম্মতির ভিত্তিতে সমাজ চালানো সম্ভব হলে দ্বন্দ্বের যে–চেহারা দেখতে পাই তা কেন দেখব। কাজেই ধরে নিতে হবে দ্বন্দ্ব বাস্তব। সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা দৈব সৌভাগ্যের কথা।

প্রশ্নটা দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি এড়াব কীভাবে তা নয়, সামলাব কীভাবে। দ্বন্দ্বের দেখা পেলেই আমরা কি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব? আমরা দু–পক্ষই তো নিজের নিজের মতো জানি যে আমরাই ঠিক। অতএব, এসো, সম্মুখ সমরে দেখা যাক কী দাঁড়ায়। এই কিন্তু সেই গায়ের জোরের কথা। সভ্যতার এত বড়াই করার পরে এতদিন বাদেও যদি দেখা যায় যে শেষমেশ গায়ের জোর ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছু নেই সেটা কি খুব স্বস্তির কথা? তাই আমাদের অন্য কোনো পথের সন্ধান করতেই হয়। সুবিধাজনক পথ কিছু না পেলে হয়তো অপেক্ষাই করতে হবে।

লড়াইয়ের পথে দ্বন্দ্ব মীমাংসার কথা যখন ভাবি আমরা তখন দুটো কথা খেয়াল করা দরকার। সম্ভবত প্রায়ই আমরা সে দুটো কথা মনে রাখি না। এক, যে–দুই পক্ষ আমরা লড়াই করছি তারা আসলে একই রকমের কিনা। দুই, এরই লাগোয়া প্রশ্ন : আমরা কি একই ক্ষমতা দখলের জন্য লড়ছি দু–জনেই? অর্থাৎ হয় তুমি নয়তো আমি। লড়াইটা দখলেরই তবে। আসলে কথাটা উঠছে ক্ষমতার সূত্রে। ক্ষমতার ঘরে পৌঁছোতে চাই বলেই হয়তো দ্বন্দ্বের পথে এসে দাঁড়িয়েছি। ক্ষমতার প্রসঙ্গে এইসব কথা ভাবতে গেলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় স্তরের ক্ষমতার কথা তো উঠে পড়ছেই। তারও নীচে নানা স্তরের ক্ষমতার কথা এসে পড়বে। হয়তো একেবারে পারিবারিক স্তর, ব্যক্তিগত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাব আমরা। এই যে অনেক সময়ে আমরা বলে থাকি, আমি বলছি — এ কাজ করতে হবে তোমাকে। এর মধ্যে কখনো থাকে বয়সের অধিকার, কখনো সম্পর্কের অধিকার, কখনো পদমর্যাদার অধিকার। এরকম নানা অধিকারের সুবাদে কর্তৃত্বের অধিকারই বস্তুত প্রয়োগ করে থাকি আমরা। ভাবলে হয়তো দেখা যাবে যে ক্ষমতার থেকে আমাদের একেবারে মুক্তিও নেই। ক্ষমতা হয়তো নাছোড় লেগে থাকবে আমাদের গায়ে। কোন ফাঁকে সে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছে তা চিনতে পারা বেশ শক্ত। চেষ্টা করলেও হয়তো পারা যায় না। আর চেষ্টা ছেড়ে দিলে তো কথাই নেই। তাই ক্ষমতা চিনে নেবার এই চেষ্টাটা চালিয়ে যাওয়া খুব জরুরি।

সংগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রসঙ্গে এই ক্ষমতার কথাটা সত্যিই খুব মারাত্মক চেহারা ধারণ করতে পারে। তখন আমাদের হাতে এসে যায় পুলিশ মিলিটারির দখল। ফলে সেই ক্ষমতার ব্যবহার বিষয়ে বেসামাল হলে বিপদ আছে। জঙ্গলমহলে আজ আমরা সেরকম বিপদের মুখোমুখি। এই কথাটা বলা মানেই কিন্তু এই নয় যে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরোধীপক্ষের অবস্থানকে অতএব সর্বতোভাবে সমর্থন জানানো হচ্ছে। বরঞ্চ ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে করার সংগত কারণ আছে যে একই ক্ষমতার চূড়ায় আমাদের দু–পক্ষের দৃষ্টিই নিবদ্ধ। তাই বলে এই মুহূর্তে ক্ষমতা প্রয়োগের যারা লক্ষ্য আর যারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, এই দু–পক্ষ কি তুল্যমূল্য নাকি? না, কখনোই তা নয়। এ কথাটা, তোমার হয়তো খেয়াল থাকবে, সেদিন আমাদের এখানে ঘরোয়া আলোচনায় উঠেও ছিল। কথা হল না যে, আমরা যদি আজ সবাই মাওবাদী বলে যাদের বলা হচ্ছে তাদের সমর্থন করি তাহলে কী ক্ষতি হয়? সবাই বলতে একেবারে রাষ্ট্র সমেত সবাই। অর্থাৎ, আপাতত যৌথবাহিনীর অভিযান ইত্যাদি যাতে বন্ধ হতে পারে। কথা হয়েছিল, অসুবিধা এই যে, সহিংস মাওবাদী, কিংবা অন্য কোনো বাদ–আশ্রয়ী যে–পথে ক্ষমতায় যাবেন সে পথে ক্ষমতায় গেলে ওই পুলিশ মিলিটারির দখল সমেত তাদের সহিংস পন্থা একই রকম বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা হিসেবে জোরজারের পথেই তো আমি ক্ষমতা দখল করেছি। ফলে আমার বিরোধী পক্ষকে আমার ভাবনায় শামিল করতে গেলে জোরের পথেই তা করব, এটাই স্বাভাবিক। জোর প্রয়োগ করতে না চাইলে ওই সেই আলোচনার পথ, হয়তো–বা অপেক্ষা।

তবে কি চলতি অবস্থার অন্যায় অবিচার বৈষম্য সবই ওই অপেক্ষার কাল জুড়ে অপেক্ষাই করবে। এখানেই আসে ওই কথাটা। ক্ষমতার চেহারা চিনে নেবার কথা। আমাদের প্রত্যেকের গায়ে লেপটে থাকা ক্ষমতার চেহারাটাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে নজর করতে শিখলে দেখব যে আমাদের নিজেদের অনেক কিছু হয়তো ঝেড়ে ফেলতে হবে। সংগঠিত বৃহৎ শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি ইত্যাদির সঙ্গে নানা পথে লগ্ন থেকে আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ক্ষমতার বৃত্তে জড়িয়ে যাই। একদিকে তাই নিজেদের দিকে একটু তাকাতে হবে, প্রত্যেককে। আর অন্যদিকে সংগঠিত বৃহৎ ক্ষমতার কায়দাকানুনও চিনে নিতে হবে। এই পথে একটু একটু করে হয়তো হিংসাকেও চিনতে শিখব। দু–রকম হিংসা তুল্যমূল্য কিনা, এই হিংসা ভালো না ওই হিংসা ভালো, এভাবে প্রশ্ন তুলে খুব কি লাভ হবে? তোমাদের পত্রিকায় এই প্রসঙ্গের আলোচনা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য রাখব। ভালো থেকো সবাই। প্রীতি জেনো। ইতি —

১৪।৬।২০১০

সৌরীন ভট্টাচার্য
কলকাতা

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়

বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [দ্বিতীয় অংশ]

অনিতা চ্যান, রিচার্ড ম্যাডসেন এবং জোনাথন আঙ্গার–এর বই 'চেন ভিলেজ : রেভলিউশন টু গ্লোবালাইজেশন' থেকে চেন গ্রামের বৃত্তান্তের দ্বিতীয় অংশ এখানে পেশ করা হল। লেখকেরা দক্ষিণ চীনের একটি গ্রামে কয়েকটি পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন। গ্রামের প্রকৃত নামটি তাঁরা গোপন রেখেছেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তাঁরা ওই গ্রাম থেকে হঙকঙে আসা ২৬ জন অভিবাসীকে সমীক্ষা করেন। পরে ১৯৮৮ থেকে ২০০৭–এর মধ্যে তাঁরা সরাসরি ওই গ্রামে গিয়ে সরেজমিন সমীক্ষা চালাতে সক্ষম হন। প্রথম অংশে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় অংশে আমরা পরবর্তী সময়ের বিবরণ পেশ করব। প্রসঙ্গত, ১৯৬০–এর দশকের গোড়া থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দক্ষিণ চীনের এই গ্রামসমাজে অসাধারণ অদলবদল ঘটে গেছে। সমগ্র চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অদলবদলের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, চেন গ্রামের বর্ণনায় তা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই সমীক্ষালব্ধ বৃত্তান্ত এক কৌমসমাজের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে আমাদের এমন এক 'মানবিক মাপকাঠি' জুগিয়ে দেয়, যা চীনের সুদূরপ্রসারিত পরিবর্তনকে জরিপ করতে সাহায্য করে। সর্বোপরি এই সরেজমিন বর্ণনা প্রচলিত র‍্যাডিকাল বামপন্থী বিপ্লবী তাত্ত্বিক কাঠামোটিকেও সার্বিকভাবে বিচার করতে কিছুটা সাহায্য করে। এটি ইংরেজি থেকে সম্পাদনা ও সংক্ষেপ করে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী। দ্বিতীয় অংশটি শেষ হচ্ছে ১৯৭০–এর দশকের গোড়ায়। পরবর্তী সংখ্যায় তৃতীয় অংশে থাকবে ১৯৭০ থেকে আজ পর্যন্ত চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায় চীনের বর্তমান পর্বের খুঁটিনাটি।

সাম্প্রতিক অতীতের কিছু কথা

সমুদ্র পার হয়ে মাইল বারো বিস্তৃত এক সমতল বদ্বীপ, মাঝে দীর্ঘ বয়ে চলা নদীটি পেরোলেই চেন গ্রামের খেত। সোনালী ফসল ভরা মাঠের পর পুকুর ঘেরা গ্রাম; পিছনে দূর্গম পর্বতশ্রেণী। ১৯৬৫ সালের শীতের সময় হেঁটে নদী পার হয়ে এই অজগাঁয়ে এসেছিল তেরজন যুবক পার্টি ক্যাডার। ক্যান্টন থেকে [পার্টি] প্রেরিত এই যুবকদের ঢাক পিটিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে গ্রামে স্বাগত জানিয়েছিল সমস্ত গ্রামবাসী। নারী–পুরুষ সকলেরই পরনে ছিল গুয়াঙদঙ চাষিদের পরিচিত কালো রঙে ছোপানো জামা আর ঢোলা কালো প্যান্ট, অনেকের পায়েই এক জোড়া চপ্পল পর্যন্ত ছিল না। তাদের খাওয়ার সময় চোখে পড়ার মতো দারিদ্র ধরা পড়ত। অধিকাংশ চাষি পরিবার আধপেট মিষ্টি আলু আর আধপেট ভাত মিশিয়ে খাওয়া সারত। চেন গ্রামের আওতায় প্রায় পাঁচশ একর কর্ষণযোগ্য জমিতে যা ধানচাষ হত, তাতে এক হাজারের কাছাকাছি জনসংখ্যার কুলোত না। অনেকসময় পাতলা ফ্যানভাত খেয়ে সকালবেলায় তো বটেই, দুপুর বা রাতেও পেট ভরাতে হত। জলাশয়ে মাছ ধরতে পারলে ক্বচিৎ জুটত; আর মাংস বছরের পালা–পার্বণ ছাড়া মোটেই খাওয়া হত না। শাকসবজি জুটত অনিয়মিত, তাছাড়া তেলের অভাবে তা রান্না করার উপায় ছিল না। একদশক পর চেনরা বাড়তি পরিশ্রম করে ধানের ফলন বাড়িয়েছিল। তাদের খাওয়াদাওয়ার অভাব রইল না। এবার শাকসবজি, মাংস–ডিম নিয়মিত খাদ্যতালিকায় এল। চিরাচরিত মাটির ঘরের বদলে তৈরি হল পাকা দালান। উঠতি বয়সের মেয়েদের পরনে এল ফুলের নকশা–কাটা ব্লাউজ। চেনদের পুরনো কূপমণ্ডুকতাও কাটতে থাকল।

চেনগ্রামে আসার পরদিনই প্রেরিত তেরজন যুবককে 'শ্রেণীশিক্ষা'র পাঠ নিতে হল। গ্রামের পার্টি–শাখা তাদের বুঝিয়ে দিল, কারা এই গাঁয়ে 'চার ধরনের খারাপ' মানুষ। যারা বিপ্লবের আগে জমিদার, ধনী চাষি ছিল এবং গুরুতর রাজনৈতিক, অপরাধমূলক অথবা সামাজিক অন্যায়ের কারণে যাদের সরকারিভাবে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা 'খারাপ লোক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সব মিলিয়ে এমন ১৮ জন মানুষ রয়েছে এই গ্রামে। এদের বউদেরও এই খারাপ মানুষের তালিকায় ধরা হয়েছিল। এদের ক্ষতিকর চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা যুবকদের জানানো হল বটে, কিন্তু সেগুলো সামনাসামনি যাচাই করে নেওয়া কখনই বহিরাগত যুবকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরবর্তী শ্রেণীর সাধারণ স্তরের শোধন

দু'বছর ব্যাপী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর পার্টির ওপরতলা থেকে নির্দেশ এল, গ্রামে নতুন প্রশাসকমণ্ডলী নির্বাচন করা হোক। ১৯৬৮ সালের মে মাসে একদিন ব্রিগেড ও প্রোডাকশন টিমের ক্যাডার ও সক্রিয় কর্মীদের সভায় ন'জন প্রার্থীর নাম সুপারিশের জন্য স্থির করা হল। প্রোডাকশন টিমের সভা থেকে আরও প্রার্থীর নাম নিয়ম মতো আসতে পারত, কিন্তু গ্রাম–নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তা করা কঠিন ছিল। কিংফা ব্যক্তিগতভাবে পার্টি–সদস্য ও টিম–প্রধানদের সুযোগ–সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কিছুটা পক্ষে টানার চেষ্টা করল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডামাডোলের সময় গ্রামকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ফলে লঙইয়ং যে মর্যাদা অর্জন করছিল, তার ভূমিকাই ফলপ্রসু হল। লঙইয়ং–এর সুনজরে থাকায় বহিরাগতদের মধ্যে আও ও গাও মনোনয়ন পেল এবং নির্বাচিত হল। কিন্তু যখন নির্বাচিতদের তালিকা কমিউনে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল, এই দুজনের নিযুক্তি বাতিল করা হল। আও পরে বলেছিল, "এটা এই কারণে হয়েছিল, যেহেতু আমার বাবা কুয়োমিনটাঙের অধীনে সেনাবাহিনীর মেডিকাল কর্পস–এ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করত ..."। অর্থাৎ আও এতখানি লাল হওয়া সত্ত্বেও তার শ্রেণী–অতীত এখানে বিচার্য হয়েছিল। আও ও গাওয়ের জায়গায় গরিব চাষি পরিবারের দুই স্থানীয় যুবককে নতুন কমিটিতে নিযুক্ত করা হল।

পিকিঙের সরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবশিষ্ট গোলমালটুকু দ্রুত শেষ করতে চাইল। আও তখনকার জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকে এইভাবে বর্ণনা করেছিল, "গোড়ায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবে দরজার খিল আলগা করে দেওয়া হয়েছিল এবং জনগণকে বিদ্রোহ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কী বিশৃঙ্খলা! ... চাষিরা বলল, এবার খিল খুব শিগগির শক্ত করে আঁটা হবে। যতই কর্মসূচিটা এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে এগোল, প্রত্যেক ধাপে পরিস্থিতি সাফ হয়ে গেল, প্রত্যেক খারাপ লোককে শোধন করা হল। মাও সেতুঙ জনতার ক্ষমতা ব্যবহার করে খারাপ লোকেদের ওপর একনায়কতন্ত্র আরোপ করলেন। ভয়াবহ! আমি ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি ফের খিলটা শক্তভাবে এঁটে ফেলা যাবে। যা গোলমাল চলেছিল!"

১৯৬৮–র গ্রীষ্মে জাতীয় পার্টি–দলিলে ভালো শ্রেণীর ওপর কুপ্রভাব ফেলা ছয় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর শোধন করার কথা বলা হল :

১. যারা চেয়ারম্যান মাওয়ের বিরোধিতা করেছে;
২. যারা ভাইস–চেয়ারম্যান লিন পিয়াওয়ের বিরোধিতা করেছে;
৩. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 'খারাপ' নেতা (আসলে এরা হল সেইসব সংগঠন–কর্তা যারা লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে) এবং সেইসব 'কালো হাত' (পরাজিত–পক্ষের মধ্যে যারা আড়াল থেকে ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে)।

৪. 'গুপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল' (খারাপ-শ্রেণীর মধ্যে যারা বিপ্লবের সময় এমন সব জেলায় চলে গিয়েছিল, যেখানে তাদের লোকে চেনে না এবং সেখানে তারা নিজেদের ভালো শ্রেণীর বলে চালিয়ে দিয়েছিল)।

৫. দুর্বৃত্ত (সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যারা লুঠ, হত্যা বা ধর্ষণের মতো অপরাধ করেছিল)।

৬. 'চার খারাপ ধরন'-এর মধ্যে যারা নিজেদের ঠিক মতো সংশোধন করেনি।

গ্রামে যারা 'শ্রেণী সাধারণ'-কে দূষিত করেছে, তাদের খুঁজে বার করে অভিযুক্ত করার জন্য জননিরাপত্তা কমিটিকে বাড়ানোর দরকার পড়ল। সাধারণত এই কমিটিতে ১০টি প্রোডাকশন টিম থেকে দশজন এবং কমিটি-প্রধান হিসেবে ব্রিগেড থেকে একজন, মোট ১১জন থাকে। তাদের কাজ ছিল ছিচকে চুরি ধরা, ব্যক্তিগত বিরোধের সালিশি করা, অসঙ্গত যৌন আচরণ নিবৃত্ত করা। এর জন্য কমিটিকে মাসে একবার কাজের পরে বসলেই চলত। কিন্তু এখন অনেক কাজ — সন্দেহজনক ব্যক্তিকে জেরা করা, তার নথিপত্র তৈরি করা, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ তৈরি করা, সংগ্রাম-অধিবেশনগুলিতে যা বলা হয়েছে তার লিখিত প্রতিলিপি তৈরি করা এবং ওপরতলার সরকারি স্তরে পাঠানোর জন্য চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা — একজন সর্বক্ষণের কমিটি-প্রধানের পক্ষে সবটা সামলানো সম্ভব নয়। তাই এইসব কাজের জন্য একটা ছোট্ট সাহায্যকারী দল গঠন করে আওকে তার প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হল।

লঙইয়ং এবং তার সঙ্গীদের কাছে গ্রামের চার খারাপ ধরনের সকলকেই অসংশোধিত মনে হল। অতএব তারা প্রথমেই শ্রেণী-সাধারণ শোধন অভিযানে তালিকাভুক্ত হল। যদিও এর আগে চার-শুদ্ধিকরণ অভিযানে তাদের যথেষ্ট হেনস্থা করা হয়েছিল। এবারও তারা বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু গ্রামের এক প্রাক্তন গেরিলাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যখন গ্রামরক্ষীদল গেল, সে কাঁটাতার হাতে এগিয়ে এল এবং সন্ত্রস্ত রক্ষীরা তাকে জেরা করার আগেই সে পাহাড়ে পালিয়ে গেল। গ্রামবাসীরা তাকে পাহাড়ে খুঁজতে যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে তার বাড়ির ওপর নজর রাখল। কয়েকদিন পর সে খিদের চোটে ফিরে এল এবং তাকে ধরা হল।

এরপর জননিরাপত্তা কমিটির নজর পড়ল, শহর থেকে প্রেরিত যুবকের মধ্যে যারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তীব্রতম মুহূর্তে ক্যান্টনে ফিরে গিয়েছিল, তাদের ওপর। এমনিতে চাষিরা বাড়তি ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এদের পছন্দ করত না। চাষিদের কাছে এরা ছিল 'ঝুটা কর্মী'। এরা ক্যান্টনে ফিরে গেলেও প্রত্যেক ফলনের পর এরা তাদের খাদ্যশস্যের রেশন নিতে চেন গ্রামে আসত। কারণ ক্যান্টনে বেআইনিভাবে বাস করার জন্য এরা কোন খাদ্যশস্য কিনতে পারত না। ১৯৬৮-র গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ক্যান্টনের সর্বত্র নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, সমস্ত প্রেরিত যুবকদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে। প্রতিবেশী কমিটি দরজায় দরজায় গিয়ে বেআইনি বসবাসকারীদের খোঁজে তল্লাশি চালাতে থাকল। যুবকেরা বুঝতে পারল, গ্রামে না ফিরে গেলে ক্যান্টনে তাদের পরিবার বিপদে পড়বে, অতএব তারা গুরুতর রাজনৈতিক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই একে একে গ্রামে ফিরে এল।

গোয়ালঘরে কারাবাস

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় 'গো-ভুত ও সর্প-দৈত্য'দের (অতিপ্রাকৃত অশুভ ভয়ংকর শক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত প্রাচীন বিশেষণ) বন্দী করে রাখার জন্য চীনের সর্বত্র 'গোয়ালঘর' নামক অস্থায়ী কারাগার গজিয়ে উঠেছিল। সরকারি নীতি অনুযায়ী অবশ্য কমিউন ও প্রাদেশিক স্তরে অভিযোগ পর্যালোচনা করেই কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া যেত। কিন্তু চীনা আইনি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় শ্রেণীর সাধারণ স্তরের শোধন অভিযানে গোয়ালঘরগুলোকেই অবৈধ কারাগার বানিয়ে ফেলা হল।

নাচগানের প্রচার ট্রুপের মঞ্চের পিছনে ড্রেসিং রুম ছিল চেন গ্রামের গোয়ালঘর কারাগার। এর একশ বর্গ ফুট মেঝের ওপর পুরুষ-নারী কয়েদিদের গাদাগাদি করে শুতে হত। প্রেরিত যুবক স্টকি ওয়াঙ ও ঝাও-কে সেখানে পাঠানো হল। যে চার-খারাপ ধরনের লোকের সঙ্গে তারা এযাবৎ লড়াই করে এসেছে, তাদের সঙ্গেই ওদের ঠাঁই হল। দশদিন পরে বিদেশি দেঙ গ্রামে আসার পর ওকেও গোয়ালঘরে পাঠানো হল। যেহেতু এই তিন যুবক কোন মারামারি, খুন, লুঠ বা গুপ্তচরবৃত্তিতে যুক্ত ছিল না, তাই ওরা মনে করছিল, পার্টির ওপরতলায় পর্যালোচনা হলে সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

১ অক্টোবর চীনা জাতীয় দিবসে এই তিন যুবক পার্টির প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য লাল কাগজ কেটে চেয়ারম্যান মাওয়ের একটা কাট-আউট ছবি তৈরি করল। চার খারাপ ধরনের পুরনো লোকেরা একদম চুপ মেরে গিয়েছিল। ভয় এবং অবিশ্বাস এতটাই তাদের মনে দানা বেঁধেছিল, অভিযানের চাপে প্রত্যেকেই অন্যের কাছে হয়ে গিয়েছিল সম্ভাব্য গুপ্তচর বা ইনফর্মার।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জেরা, জিজ্ঞাসাবাদ আর শহর থেকে প্রেরিত অন্য বন্ধুদের বেফাঁস জবানবন্দীর চোটে তিন যুবকের হালকা মেজাজ উবে গেল। এই জেরার কাজে সবচেয়ে জবরদস্ত ভূমিকা নিয়েছিল প্রেরিত যুবতী আও। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সে বিদ্রোহী প্রেরিত যুবকদের প্রতি গ্রামের চাষিদের চেয়েও খেপে গিয়েছিল। সে কঠোর পরিশ্রম করত। একান্ত ধর্মপরায়ণের মতো সে গ্রামের বার্তাবাহক ও মাও চিন্তাধারা প্রচারক হিসেবে কাজ করে যেত। যারা সেই বিশ্বাস ও স্থানীয় আদেশ থেকে বিচ্যুত হত, তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনাই ছিল তার কাজ। সে মাও চিন্তাধারা নিয়ে চর্চা করত না, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করত।

নানারকম ছলনায় প্রলুব্ধ করা, শাসানি এবং চীনা আইন প্রক্রিয়ার শ্লোগান — 'যারা খোলাখুলি স্বীকার করবে তাদের প্রতি নরম এবং যারা প্রতিরোধ করবে তাদের প্রতি কড়া' — অবিরাম আউড়ে একে একে বন্দী প্রেরিত যুবকদের স্বীকারোক্তিতে বাধ্য করে ফেলা হয়।

একথা ঠিক যে স্টকি, দেঙ, ঝাও এবং তাদের বন্ধুরা চেয়ারম্যানের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান দেখিয়েও দুঃসাহসের বশে মাওকে 'বুড়ো মোটকা' বলে ঠাট্টা করত। এই সম্বোধনটা ক্যান্টনে যুবকমহলে চলত। প্রেরিত যুবকেরা ক্যান্টনে থেকে গেলে এইসব উক্তি নিয়ে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু চেন গ্রাম তো ক্যান্টন নয়। চেনচাষিরা কখনও 'মাও সেতুঙ' পর্যন্ত বলত না, তারা আরও সম্মান দিয়ে বলত 'চেয়ারম্যান মাও'। স্টকিদের ওইসব মন্তব্য আওর কাছে মাও-বিরোধী, লিন পিয়াও-বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবাচক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হল।

দেঙের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-অধিবেশন চলার একদিন পর কিংফাকে গ্রামরক্ষীরা উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নিয়ে এল। কিংফা এবং তার সাথীরা ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করে সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিংফাকে অতীতে চার সংশোধন অভিযানে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ১৯৬৬ সালের ১৬ মে'র আগেকার ব্যাপার। এমনিতে সে শ্রেণী-মর্যাদায় ছিল গরিব চাষি, গ্রামের কমিউনিস্ট পার্টি-শাখার দীর্ঘদিনের সদস্য এবং এক উপযুক্ত গ্রামনেতা। বিপ্লবের অনেক আগে সে ছিল এক দুঃস্থ অনাথ সন্তান, তার বাপ-ঠাকুর্দা অবশ্য জমিদার ছিল। কিন্তু জননিরাপত্তা কমিটির সাহায্যকারী দল তাকে ফাঁসাতে সেই প্রবাদের পন্থা নিল : 'একটা ফলের প্রকৃতি বোঝা যায় তার মূল থেকে,

একজন মানুষের শ্রেণী–মূল থেকে তার প্রকৃতি টের পাওয়া যায়'। আও পরে স্মৃতিচারণ করেছিল এইভাবে : "আমরা ওর পুরনো কাদা খুঁচিয়ে তুললাম ... ওকে বলা হল 'জমিদারের সন্তান' এবং আমরা দেখালাম যে, ওর পুরনো শ্রেণীর দুর্গন্ধ ওপরে উঠে এসেছে। সেই কারণে সে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের প্রতি এত বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে ... ও সেই অত্যাচারী শ্রেণীর বংশধর, যারা সমাজতন্ত্রকে ঘৃণা করত এবং যারা সমষ্টিগত অর্থনীতিকে [সাংস্কৃতিক বিপ্লবে] ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে!"

লঙইয়ং অবশ্য এইসব অধিবেশনে সামনাসামনি এল না। কারণ তাহলে লোকে এর মধ্যে কিংফার ওপর তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার গন্ধ পেত। জননিরাপত্তা কমিটির সদস্য বান্ডি–কে কিংফার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সাজানোর কাজে নিযুক্ত করা হল। কিংফা কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনা অধিকাংশ অভিযোগই মেনে নিল। সে স্বীকার করল যে, চার সংশোধন অভিযানের সময় সে খারাপ কাজ করেছে; সে তার শ্যালক ও সাথীদের সঙ্গে মিলে গ্রাম কমিটি নির্বাচনের ফল ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে; শুধু হঙকঙে পালিয়ে যেতে চাওয়ার অভিযোগ সে মানল না।

কমিউন স্তর থেকে এক প্রতিনিধি এসে স্থানীয় সাহায্যকারী দলের জেরার সময় উপস্থিত থাকল এবং কিংফার বিরুদ্ধে অভিযোগে অনুমোদন দিল। কিংফা প্রকাশ্যে অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু স্টকি ওয়াঙ পরে কিংফা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছিল এইভাবে : "সে হয়ত সামান্য দুঃখপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু একজন চাষি হিসেবে শেষে সে ব্যক্তিগত স্তরে বলেছিল, এটা তার ভাগ্যের ফল, জন্মসূত্রেই তার ভাগ্য খারাপ ছিল ... এর থেকে সে একটা শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে সে মনে করে, তার ভুল খুব বেশি ছিল না।"

গ্রামের ক্যাডাররা এই অভিযানে নিজেদের যথেষ্ট 'লাল' প্রমাণ করার জন্য এটুকুতেই থামল না। এবার ব্রিগেড রাত্রিকালীন সভায় বসে গ্রামবাসীদের কাছে যারা অপ্রিয়, তাদের চিহ্নিত করতে শুরু করল। বিপ্লবের আগে কুওমিনটাঙের পক্ষ থেকে প্রত্যেক গ্রামে কমিউনিজমকে দমন করার জন্য একটা 'পারস্পরিক দায়িত্বশীল গোষ্ঠী' গঠন করা হয়েছিল এবং পুর–শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতি একশ পরিবার পিছু একজন করে নিরাপত্তা–প্রধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু চাষিকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্তু অনেক চাষিরই এদের ওপর রাগ ছিল। চেন গ্রামে এরকমই এক ঝগড়ুটে বুড়োকে পাকড়াও করা হল।

যেহেতু এটা ছিল একটা গণ–অভিযান, তাই এবার সাধারণ গ্রামবাসীরা যাদের অপছন্দ করত, তাদের দিকে আঙ্গুল তোলা হল। চার খারাপ ধরনের লোকের আত্মীয়দের আক্রমণ করা হল, এদের অর্ধেক ছিল বকবক করা বিধবা। এদের মধ্যে পড়ল এক জমিদারের মাঝবয়সী মেয়ে। তার ধনী চাষি স্বামী ভূমি সংস্কারের সময় গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাওয়ার পর তার আর্থিক অবস্থা তদন্ত করে তাকে গরিব চাষি হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হল। কিন্তু তার এক প্রতিবেশী পরে মন্তব্য করেছিল : "ওকে ওর আত্মীয়রা হঙকঙ থেকে অর্থ পাঠাত। ফলে ওকে গতর খাটাতে হত না। অন্যরা ওকে হিংসে করত।"

চারজন কিশোরী মেয়ে ঋতুমতী হওয়ার সময় থেকে ওর বাড়িতে থাকত। গুয়াঙদঙ প্রদেশে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা বহু গ্রামে নিজেদের ঘর ছেড়ে দলবেঁধে এইভাবে যেখানে শুত সেগুলোকে বলত 'যুব–ঘর'। ছেলেরাও বন্ধুবান্ধব মিলে পোড়োবাড়ি বা অস্থায়ী উঠোনে, যেমন ব্রিগেড রক্ষীদলের সদর দপ্তরের ওপর থাকত। ওই মহিলা ওদের সেলাই ইত্যাদি শেখাত এবং নানারকম সেকেলে যৌন বিষয়ক গল্প বলত। আওয়ের কাছে সেগুলো আপত্তিজনক মনে হল। ঐ মেয়েরাও ঐ বিধবা মহিলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলল। ফলে তাকে গোয়ালঘরে পাঠানো হল। সে কিন্তু সংগ্রাম–অধিবেশনে ছেড়ে কথা বলল না, প্রচণ্ড খেপে উঠল। অবশেষে তাকে বাড়ি ফেরৎ পাঠানোর আট–দশ সপ্তাহ পর তার মৃত্যু হল।

খারাপ শ্রেণীর বউ–বাচ্চাদের টেনে আনার কারণ কী ছিল? পরে আওয়ের যুক্তিটা শোনা গিয়েছিল : "জমিদারদের ছেলেপুলেরা কি খারাপ–শ্রেণীর পরিবারে জন্মানোর কারণে নিম্নমানের নয়? আমার বাবার একটা (খারাপ) রেকর্ড থাকার জন্য কি আমাকে হারতে হয়নি?" চেন গ্রামে এইভাবে কোন ব্যক্তির দোষের দায় অন্যদের ভাগেও গিয়ে পড়েছিল। গ্রামের নগ্নপদ চিকিৎসক এক যুবককে কিংফা অতীতে প্যারামেডিকাল ট্রেনিংয়ের জন্য মনোনীত করেছিল। বিদ্রোহী মাওবাদী রেড গার্ডের মধ্যে যে ক'জন চাষি–যুবক যোগ দিয়েছিল, সে ছিল তাদের একজন। পরে সে কিংফাকে ভোটের ফল ঘোরানোর পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিল। লঙইয়ং চাইল তাকেও জেরা করা হোক। জেরার সময় সে এতটাই ভয় পেয়ে গেল যে, সে নিজে থেকে স্বীকার করল, বছরখানেক আগে সে বারো বছরের এক মহিলা–রোগীকে অজ্ঞান অবস্থায় যৌন নিগ্রহ করেছে। সংগ্রাম–অধিবেশনে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা তাকে সবচেয়ে বেশি মারধোর করে।

শরৎকালে যখন চাষের কাজ হালকা ছিল, দু'মাস যাবৎ সংগ্রাম–অধিবেশন চলেছিল। মোটামুটি কুড়িজনকে গোয়ালঘরে কোন না কোন সময় কাটাতে হয়েছে। নভেম্বরে মাঠের কাজে কর্মব্যস্ততা এসে গেল। পাশাপাশি সমস্ত গ্রামে অবশ্য একই তীব্রতায় এই অভিযান চলেনি। এমন গ্রামও ছিল, যেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাধা হয়নি। ১৯৬৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধেও বিদ্রোহীদের দমন করতে রক্ষীদলকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পুরো জেলার হিসেব মতো কয়েক'শ বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৬৯–এর গোড়ায় প্রদেশ থেকে সেনা পাঠিয়ে সেই জেলার নিয়ন্ত্রণ আনার পর শোধন অভিযান শুরু হয়। তাতে চার খারাপ ধরনের লোক এবং তাদের মতো কাউকে কাউকে সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সবচেয়ে মনে রাখার মতো ঘটনা ছিল এই যে, সেনারা রক্ষী–প্রধান, জেলা ও কমিউন কর্মচারীদের তৎকালীন গণহত্যার জন্য গ্রেপ্তার করেছিল। বেসরকারি মতে, ক্যান্টনের এক বিক্ষুব্ধ লি ঈঝি গোষ্ঠীর ১৯৭৪ সালের ইশতেহার থেকে জানা যায়, গুয়াঙদঙ প্রদেশে (জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটি) এই অভিযানে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ মারা যায় এবং ১০ লক্ষ মানুষকে সংগ্রাম–অধিবেশনগুলোতে টেনে আনা হয়েছিল। সেই তুলনায় চেন গ্রামের হাজারখানেক মানুষের মধ্যে কুড়িজনের গোয়ালঘর বাস এবং একজনের মৃত্যু প্রদেশের গড় হিসেবের মধ্যেই ছিল।

একে একে গোয়ালঘর ফাঁকা হতে শুরু করল। ছ'সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে প্রেরিত–যুবক যেদিন ছাড়া পেল, সেদিন একটা সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল। তার স্মৃতিচারণে পাওয়া যায় : "ওরা আমাকে বেরিয়ে এসে স্বীকারোক্তি করতে বলল। আমি আগে যা বলেছিলাম, একই কথা বললাম। লঙইয়ং সভাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওর ব্যাখ্যাটা এখন আগের চেয়ে ভালো হয়েছে! আপনাদের কী মনে হয়, ও মন খুলে কথা বলছে না? আর চাষিরা লঙইয়ংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনেই বুঝে নিয়েছিল ওর সিদ্ধান্তটা। অতএব তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, ও মন খুলে বলছে!' তারপর লঙইয়ং বলল, 'আমরা কি ওকে ছেড়ে দেব?' 'হ্যাঁ ছেড়ে দেওয়া হোক।' সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল। ... [হেসে] যেন জনগণকে নাটকের অভিনয়ে নির্দেশ দেওয়া হল।"

গোয়ালঘরের বৃত্তটা ছোটো হয়ে এল। রইল মাত্র পাঁচজন : প্রাক্তন গেরিলা, নগ্নপদ চিকিৎসক, স্টকি ওয়াঙ, বিদেশি দেঙ এবং কিংফা। এদের

অপরাধ এতই গুরুতর ছিল যে, ব্রিগেড স্তরে মীমাংসা হওয়া সম্ভব ছিল না। এদের অপরাধের রিপোর্ট ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার জন্য কমিউনে পাঠানো হল। নির্দেশ না পাওয়ায় মামলা ঝুলে রইল। ইতিমধ্যে এদের কড়া প্রহরায় রাখা হল।

বামমুখী যাত্রা

সংগ্রাম-অধিবেশন চলতে চলতেই চেন গ্রামে এক নতুন পদক্ষেপের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। চীন জুড়ে এক সর্বোচ্চ মাও-পুজার নির্দেশ এল পার্টির পক্ষ থেকে। চেয়ারম্যান সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিপ্লবের শত্রুদের ধ্বংস করেছেন, তিনি চীনের রক্ষাকর্তা, তিনি যা বলেছেন অথবা চেয়েছেন সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। অতএব সারা দেশকে তাঁর প্রতি 'তিন আনুগত্য' প্রদর্শনের নির্দেশ এল — মাওয়ের প্রতি আনুগত্য, মাও চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর বিপ্লবী লাইনের প্রতি আনুগত্য।

সেই আনুগত্য দেখাতে চেনরা সান্ধ্যকালীন রাজনৈতিক সভায় মিছিল করে মাওয়ের ছবি সাঁটা বড়ো বড়ো কাঠের প্ল্যাকার্ড নিয়ে যেত। সেখানে সকলে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে আনুগত্য-নৃত্য করত, সঙ্গে চলত গান — 'সমুদ্রযাত্রায় ভরসা কাণ্ডারী, বিপ্লবের সাফল্যে ভরসা মাও চিন্তাধারা'। দক্ষিণ চীনের সংস্কৃতিতে নাচের চল ছিল না। ফলে বহু চাষি, বিশেষত বয়স্করা সকলের সামনে নাচতে অস্বস্তিতে পড়ত। কিন্তু সকলেই — লেখাপড়া জানুক আর না-ই জানুক — সভায় সঙ্গে করে ছোট্ট রেডবুক নিয়ে আসত এবং বক্তৃতা বা আলোচনার সময় সেটা হাতে তুলে নাড়ত। এছাড়া, প্রত্যেক বাড়িতেই মাওয়ের চার খণ্ডের রচনাবলী উপযুক্ত স্থানে সাজানো থাকত। খাওয়ার আগে সেনাবাহিনীর ঢঙে (সেখানে মাও-আচারগুলো অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল) পরিবারের কর্তা মাওয়ের ছবির সামনে মাথা নত করত, সকলে মিলে মাও-পাঠ করত, 'পূর্ব দিগন্ত লাল' গাইত। একটা সাধারণ প্রশস্তি গ্রামে চালু ছিল এইরকম : "আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের লালের চেয়ে লালতম সূর্য মহান নেতা চেয়ারম্যান মাওয়ের মঙ্গল কামনা করি। আর ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াওয়ের সুস্বাস্থ্য কামনা করি; তিনি আজীবন সুস্থ থাকুন। ভূমি সংস্কারের দ্বারা মুক্ত হয়ে আমরা কখনই কমিউনিস্ট পার্টিকে ভুলব না এবং বিপ্লবে আমরা চিরকাল চেয়ারম্যান মাওকে অনুসরণ করব।"

আও ব্যাখ্যা করেছিল, মধ্যবয়সী পূর্বতন গরিব চাষিরা অতীতে খুবই কষ্ট পেয়েছে এবং মাওয়ের জন্য তাদের জীবনের বিরাট উন্নতি হয়েছে। এরাই মাও প্রশস্তির সবচেয়ে কট্টর সমর্থক। কমবয়সী চাষিদের কাছে এইসব আচার ছিল বোকার মতো ব্যাপার। কিন্তু তা উচ্চারণ করার উপায় ছিল না। গোয়ালঘরের অভিজ্ঞতা তখনও টাটকা। আওয়ের নিজের কাছে ব্যাপারটা ছিল এইরকম : "আমি নিজে [খুব সক্রিয়ভাবে] এতে অংশ নিতাম, কারণ পার্টি আমাকে যা বলত, আমি তা-ই করতে চাইতাম।"

চোদ্দটা জেলা মিলে পার্টির সদর দপ্তর থেকে প্রেরিত নির্দেশে আনুগত্য প্রদর্শনের পাশাপাশি বলা হয়েছিল, "নতুন অভিযানে জনসাধারণের চিন্তাকে উন্নত করতে চাওয়া হল, তারা মাও চিন্তাধারায় মনোনিবেশ করুক এবং তাদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করুক।" কিছু চেন ক্যাডারের এব্যাপারে দ্বিমত ছিল। কিন্তু শোধন অভিযানের পরপর এবং মাও-ভক্তি প্রদর্শনের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের এব্যাপারে টুঁ শব্দ করার জো ছিল না।

শুয়োর-ব্যাঙ্ক হাতছাড়া হল

ভূমি সংস্কারের সময় ফলের গাছ আর বাঁশঝাড়গুলো ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন সেগুলো টিমের হাতে ফেরত দিতে বলা হল। যে সন্ধ্যায় এই ঘোষণা হল, পরিবারের সদস্যরা পাহাড়ের কোল থেকে সমস্ত বাঁশ কেটে নিয়ে চলে এল। এই বাঁশ তাদের ঝুড়ি বোনার কাজে লাগত। পরদিন সকালে টিমকে বাঁশের গোড়াগুলো দান করা হল। ক্যাডাররা এক পুরনো জমিদারের ছেলেকে বাঁশ কাটার জন্য পাকড়াও করে গোয়ালঘরে চালান করে দিল। অন্তর্ঘাত করার জন্য তার একমাস জেল হল। বাকি গ্রামবাসী এর বার্তাটা টের পেল।

উর্ধতন পার্টি স্তরের সুপারিশ অনুযায়ী ব্রিগেড এবার চাষিদের মাছ ধরার জালগুলো চাইল। সকলেই তা ভালো ছেলের মতো তুলে দিল। কেউ কেউ জালের তামার ওজনগুলো রাখতে চাইল। ব্রিগেড ঘোষণা করল, এই লোকগুলো অনুগত নয়। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ব্রিগেডের কাছে জমা পড়ে গেল।

এরপর কথা উঠল, চাষিদের নিজেদের যে পারিবারিক ভূমিখণ্ড আছে, সেগুলো থাকায় টিমের সমষ্টিগত উৎপাদন মার খায়। ক্যাডাররা বলল, তাহলে কয়েকজন কর্মী আগে এগিয়ে এসে নিজে থেকে সেই জমি টিমের হাতে তুলে দিক; অন্যরা সেই মডেল অনুসরণ করবে। যারা তা করবে না, তারা রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া হিসেবে অভিযুক্ত হবে।

যখন সমস্ত চেন ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ড টিমের হাতে তুলে দিল, ক্যাডাররা উৎসাহিত হয়ে ওপরতলার নির্দেশ ছাড়াই কাজের পরে চাষিদের ঘাস কাটা নিষিদ্ধ করল। ক্যাডাররা লক্ষ্য করেছিল, অনেক চাষি টিমের কাজে দম বাঁচিয়ে রেখে কাজের ঘন্টার পরে ঘাস কাটে। এখন ঘাস কাটা উৎপাদন টিমের অন্যতম সমষ্টিগত পার্শ্ব-কাজ হিসেবে গণ্য করা হল। এরপরই উঠল পালিত শুয়োরছানাগুলো হাতছাড়া করার প্রস্তাব। শুয়োর পালনে চেন গ্রামের একটা দক্ষতা ছিল, সেই শুয়োরছানাগুলো অন্য গ্রামে বিক্রি হত। পাহাড়ে যে ঘাস গজাতো, সেগুলো রান্না করে শুয়োরছানাদের খাওয়ানো হত। এতে ওদের স্বাস্থ্য ভালো থাকত। নদী তীরবর্তী গ্রামে জ্বালানির অভাব, সেখানে এই শুয়োরছানার ভালো দাম পাওয়া যেত। আশি শতাংশ চেন পরিবারে একটা শূকরী ছিল, তা থেকে দু'বছরে ত্রিশটা শুয়োরছানা পাওয়া যেত। একজন পরিবারকর্তা ছ'মাসে টিমের চাষ থেকে যা আয় করত, প্রায় তার সমান আয় হত এই শুয়োরছানার বিক্রি থেকে। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ডের ঘাস ছাড়া চেনরা পালিত জন্তু ব্রিগেডের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল। চাষিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, এই নতুন অভিযান একটা খারাপ আবহাওয়া। কিন্তু অন্য গ্রাম এবং জেলাতেও চাষিদের 'স্বার্থপরতা' ত্যাগ করতে বলা হচ্ছিল।

ব্যক্তিগত উপার্জনের উদ্যোগ হারিয়ে চাষিরা ঘন্টা পড়তেই কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে আসত। ঘরে এসে তাদের কথায়, সেই 'গতানুগতিক ভাত খাওয়া'। এতে অবশ্য আরাম পাওয়া গেল। কিন্তু যেসব পরিবার ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে পুরো আয়ের এক-চতুর্থাংশের বেশি লাভ পেত, কিংবা যাদের ঘরে বাচ্চাকাচ্চা বেশি ছিল, তারা বিপদে পড়ল।

এরপর এই নতুন অভিযানে জমির মালিকানা এবং মজুরির হিসেব রাখার দায়িত্ব টিমের হাত থেকে হঠাৎ ব্রিগেডের হাতে চলে গেল। চাষিরা এখন টিমের প্রধানের অধীনে একটা কাজের স্কোয়াড হিসেবে ব্রিগেডের নির্দেশে কাজ করতে শুরু করল। ব্রিগেডের অনেক ক্যাডার উদ্বিগ্ন হল, আদৌ এই নতুন ব্যবস্থা কাজ করবে কিনা। কিন্তু উর্ধতন পার্টি কর্তৃত্ব এবং নিচুতলার উৎপাদন টিমগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে বিভিন্ন পলিসি কার্যকর করতে খুবই অসুবিধা হত। এখন আর টিমের ঝামেলা রইল না। লণ্ডইয়ংও বেশ খুশি হল। তার কর্তৃত্ব আর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল।

শহর থেকে প্রেরিত মাও-প্রচারকদের মধ্যে আও এবং অন্য কয়েকজন এই ব্যবস্থাকে মনে করেছিল গ্রামের আরও বেশি সাম্যবাদের দিকে এগোনোর ধাপ। কিন্তু চাষিরা মোটেই এতে খুশি হয়নি। বিশেষত অবস্থাপন্ন

টিমগুলো মনে করল, যে কঠিন পরিশ্রম ও দক্ষতার জোরে তারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে, তার ফসল চলে গেল বারোয়ারি দখলে। শোনা যায়, চীনের অন্যত্রও অবস্থাপন্ন টিমগুলো এই পদক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। দরিদ্রতর টিমের সদস্যরাও এতে খুশি হয়নি। তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও টিমের পরিচয়টা হারাতে চায়নি। আরও বড়ো একটা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় গুরুত্ব পাচ্ছিল না। এর প্রভাব পড়ল মাঠে চাষের কাজে। টিমগত জায়গা থেকে প্রত্যেকের একটা প্রতিযোগিতার বোধ ছিল এবং সেখান থেকেই তারা উৎপাদনে উদ্যোগী হয়ে উঠত। এখন কারোরই আর কোন দায়বোধ থাকল না। অন্যান্য গ্রাম থেকেও এই উদ্যোগহীন কাজের খারাপ ফলের রিপোর্ট আসতে থাকল। এক মাসের মধ্যেই পার্টির ওপরতলার নেতৃত্ব চাষিদের অসন্তুষ্টি টের পেয়ে পিছু হটল। মাও পূজা এবং দমনমূলক শ্রেণী-শোধন অভিযানেও চাষিদের বশে আনা গেল না। টিমের মালিকানা ফিরিয়ে আনতে হল, চাষিদের জয় হল। কয়েক মাস পরে ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ড, গাছপালা এবং শুয়োরছানাগুলোও ফেরত পাওয়া গেল।

বেশ কয়েক বছর পরে, পার্টি 'তিন আনুগত্য' কর্মসূচির বাড়াবাড়ির জন্য লিন পিয়াওকে দায়ী করেছিল। নতুন অভিযানের সমস্ত পদক্ষেপকে যে সমর্থন করেছিল, সেই আও ব্যাখ্যা করেছিল, "মাও সেতুঙকে যাতে জনগণ ঘৃণা করে তার জন্য এই সমস্তটাই লিন পিয়াওয়ের লাইন"।

বন্দীদের সাজা

'সংগ্রাম'-এর পর্ব পার হয়ে যখন 'তিন আনুগত্য' গ্রামে প্রধান বিষয় হয়ে উঠল, গোয়ালঘরের পাঁচ বন্দীর রোজকার রুটিনবাঁধা জীবন চলতে থাকল। সকালে উঠে মাওয়ের ছবির সামনে মাথা নিচু করে নিয়মমাফিক 'তিনবার ক্ষমা ভিক্ষা করা'; তারপর সশস্ত্র রক্ষীদের প্রহরায় মাঠে যাওয়া। প্রথম মাসে সারাদিন কাজের সময় তাদের গলায় ঝুলত প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা থাকত শ্লোগান : 'লিউ শাও চি-র কট্টর সমর্থক', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালো হাত', 'প্রতিবিপ্লবী'। একটু পুরনো হয়ে যাওয়ার পর এগুলো সরিয়ে ফেলা হল। কিন্তু এদের সবচেয়ে কঠিন আর নোংরা কাজ দেওয়া হত, যেগুলো সাধারণত 'চার ধরনের খারাপ' লোকেদের দেওয়া হত। সন্ধ্যায় আবার পাহারা দিয়ে এদের গোয়ালঘরে বন্দী করা হত। রোজ তিনবার এরা খাবার পেত। কিংফা, নগ্নপদ চিকিৎসক এবং প্রাক্তন-গেরিলার পরিবার থেকে খাবার আসত। কিংফার বৌ অবশ্য তার সঙ্গে দূরত্ব রাখার জন্য তার ছোটো মেয়েকে দিয়ে খাবার পাঠাত। সকলেই তাদের খাদ্যশস্যের রেশন পেত। অন্য খাবারের জন্য দুই প্রেরিত শহুরে যুবক স্টকি ওয়াঙ ও বিদেশি দেঙ তাদের বন্ধুদের ওপর ভরসা করত। একজন আধ-কালা গরিব চাষির বিধবা বৌকে দেঙ গ্রামে আসার পর আর্থিক সাহায্য করেছিল। সে দেঙের জন্য রান্না করে নিয়ে আসত। দেঙ তাকে মাংস কিনতে পয়সা দিত। স্টকি ওয়াঙ নিজেই ভাত রান্না করে খেত। কখনও কখনও সে মাঠ থেকে বাঁধাকপির পাতা কুড়িয়ে আনত। একবার সে ধরাও পড়ে গেল চাষিদের হাতে। কিন্তু দয়াবশত তারা ওকে ছেড়ে দিল। পরে একজন গরিব চাষি মহিলা ওর জন্য রান্না করে দিত।

পাঁচ বন্দী ক্রমে এই রুটিন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। কেবল কিংফার চুলগুলো এই ক'মাসে ধূসর হয়ে গেল। 'তিন আনুগত্য'-এর পর্ব শেষ হওয়ার মুখে এদের মামলার নিষ্পত্তি করার কথা এল কমিউন থেকে। চীনের 'গণ-লাইন'-এর নীতি অনুযায়ী জনসাধারণ পরামর্শ দেবে বন্দীদের কী সাজা হবে। দেঙ ছাড়া বাকি চারজন চূড়ান্ত স্বীকারোক্তি সভায় প্রত্যেকটি অভিযোগ মেনে নিল। কেবল দেঙ মানল না যে সে প্রতিবিপ্লবী বিদেশি বেতার-বার্তা শুনেছে, কিংবা গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। জননিরাপত্তা কমিটি গ্রামবাসীকে জানাল, যারা দোষ স্বীকার করবে তাদের লঘু সাজা হবে, যারা অনুতপ্ত নয়, তাদের লম্বা শাস্তি হবে, এটাই জাতীয় নির্দেশিকা। কীভাবে এই নীতির প্রয়োগ হবে? ব্রিগেড বলল, যেহেতু নগ্নপদ চিকিৎসক কবুল করেছে যে সে ধর্ষণ করেছে, তাই তার মামলাটা নরম করে দেখা হবে। অন্যদিকে দেঙকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে কড়া সাজা দেওয়া হবে। এই দুজনের বিষয়টা প্রত্যেক উৎপাদন টিমে আলোচনায় নিয়ে আসা হল। দেঙের জন্য বিশ বছরের কঠিন শ্রমদণ্ড এবং শিশু-ধর্ষকের জন্য দু'বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব এল। কয়েকজন মহিলা অবশ্য বলল, ধর্ষণ হল পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ জিনিস। ওকে দশ বছর জেলে রাখা হোক। এই মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে মাও-প্রচারকদের দায়িত্ব বর্তাল 'জনগণের মতামতকে সাহায্য করা', যাতে চাষিরা একটা সহমতে পৌঁছাতে পারে। কিংফা ও প্রাক্তন-গেরিলার আট বছরের কারাদণ্ড এবং ওয়াঙের পাঁচ বছর কারাদণ্ডে সকলে একমত হল। সমস্ত মতামত সংগ্রহ করে ব্রিগেড সুপারিশগুলো কমিউনের কাছে পাঠিয়ে দিল।

এইসময় জাতীয় ও প্রাদেশিক সংবাদপত্রে কিছু প্রবন্ধ বেরোতে শুরু হয়, তাতে লেখা হয়, শোধন-অভিযানে অনেক বেশি মানুষকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং মামলাগুলো খুবই মারাত্মকভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ক্যান্টনের 'সাদার্ন ডেলি' পত্রিকায় একের পর এক এইধরনের সম্পাদকীয় লেখা হয়। চেয়ারম্যান মাওকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, "আক্রমণের লক্ষ্যকে সংকুচিত করে ফেলা উচিত এবং অনেক বেশি মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে সাহায্য করা উচিত। তথ্যপ্রমাণের গুরুত্ব এবং তদন্ত ও সমীক্ষার ওপর জোর ফেলা উচিত। স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া এবং সেই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। ভালো মানুষ যারা ভুল করেছে, তাদের আমরা শিক্ষা নিতে সাহায্য করব। যখন তারা সজাগ হবে, তখন দেরি না করে তাদের আমরা মুক্ত করে দেব।" বোঝা গেল, যাদের এখনও অপরাধী হিসেবে আক্রমণ করা হচ্ছে, শেষ বিচারে তারা অপরাধী নাও হতে পারে। ব্রিগেডের কঠোর সাজার সিদ্ধান্তের দু'সপ্তাহের মধ্যেই কমিউন থেকে বার্তা এল, যেসব অপরাধ দেখানো হয়েছে ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে, তার বেশিরভাগই প্রমাণিত অপরাধমূলক কাজ নয়। ব্রিগেডকে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল।

শ্রেণী শোধন অভিযানের বাড়াবাড়িতে চাষিরা বিভ্রান্ত এবং উৎসাহহীন হয়ে পড়েছিল। অভিযানের চরম পর্যায়ে তারা রাজনৈতিক সভায় যেরকম সময় মেনে উপস্থিত হচ্ছিল, ক্রমশ তাদের আর আগ্রহ ছিল না। তারা চাইছিল বিশ্রাম আর শান্তিতে ঘরে সময় কাটাতে। আও তার বেতার-ঘোষণায় কোন রাতের সভা স্থগিত করলে তারা খুশিতে ফেটে পড়ত। আও বেতারে গানবাজনা এবং ক্যান্টন থেকে সংবাদ প্রচারের দিকে ঝুঁকল।

গ্রামবাসীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইলেও ব্রিগেডের নেতাদের উদ্বেগ বাড়ছিল — কী হবে শোধন-অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে? তবে কি ছোটোখাটো ভুলের জন্য মানুষকে আক্রমণ করার জন্য তাদের ঘাড়ে দোষ পড়বে? মার্চ মাসের গোড়ায় তিনজন পার্টি ক্যাডারের একটি ওয়ার্কটিম চেন গ্রামে এল। কিন্তু তারা একটা সাধারণ সভা পর্যন্ত না করে তড়িঘড়ি ফিরে গেল। এরপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছ'জন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যের আর একটি ওয়ার্কটিম এল। এরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিদ্রোহী একটি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা ব্রিগেডের ক্যাডারদের অভিবাদন আর হৈচৈকে পাত্তা দিল না। এরা এক-একজন ক্যাডারকে আলাদা আলাদা করে জেরা করতে শুরু করল। আওকে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে সে কিংফা এবং শহর থেকে প্রেরিত যুবকদের ওপর বাড়তি আক্রমণ করেছে। সে তখন প্রকাশ্যে বলতে

বাধ্য হল, এইসব ভুলের জন্য লঙইয়ং দায়ী। মাত্র এক সপ্তাহ গ্রামে থেকে সকলকে ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে ওরা ফিরে গেল।

মে মাসের গোড়ায় দু'জন ক্যাডারের তৃতীয় ওয়ার্কটিম এল। তারা ঘোষণা করল, শ্রেণী শোধন অভিযানের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য তারা এসেছে। তারা যুক্তি সহকারে সংক্ষেপে জনসভায় বলল, যে পাঁচজনকে গোয়ালঘরে পাঠানো হয়েছে, পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের 'শত্রু এবং আমাদের মধ্যেকার বৈরি দ্বন্দ্ব'–এর মধ্যে ফেলা যায়, নাকি 'জনগণের মধ্যেকার অবৈরি দ্বন্দ্ব'–এর মধ্যে ফেলা যায়। স্থানীয় পার্টির শাখাকে তারা শুধরে নিতে সাহায্য করবে এবং নতুন যুবকদের পার্টির সদস্য করার ব্যাপারেও সাহায্য করবে। এছাড়া, নতুন করে ব্রিগেড পরিচালন সমিতি (এইসময় থেকে বলা শুরু হল 'বিপ্লবী কমিটি') নির্বাচন করার ব্যাপারেও তারা তদারকি করবে। এই কথাগুলো বলতে তারা সময় নিয়েছিল মাত্র দশ মিনিট। চাষিরা শুনে খুবই মুগ্ধ হল এবং ওদের তারিফ করল।

এবার গ্রামে তারা সকলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। হতাশ গ্রামবাসী, গোয়ালঘরের বন্দীদের সঙ্গেও সহানুভূতি সহকারে কথা বলা হল। বন্দীদের নথিপত্র সঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করল ওরা। কিংফা এবং শহুরে দুই যুবককে ওরা আশ্বস্ত করল যে, তাদের বিষয়টা নেহাত 'ভালো মানুষের ভুল' অর্থাৎ অবৈরি দ্বন্দ্ব।

পরের সপ্তাহগুলোতে কয়েকদিনের মধ্যে জেলার নেতৃত্ব নগ্নপদ চিকিৎসককে শ্রম–সংশোধন শিবিরে দু'বছর রাখার সাজা দিল। একে একে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথমে ছাড়া হল কিংফাকে। সে প্রকাশ্য জনসভায় তার চূড়ান্ত স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে আবেগ ভরে কেঁদেই ফেলল। সে গরিব এবং নিম্ন–মধ্য চাষিদের কাছে, কমিউনিস্ট পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাওয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ওয়ার্কটিম তার এই আবেগকে বাহবা জানাল। তাকে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক স্তরে রাখা হল।

কয়েক সপ্তাহ পরে ওয়ার্কটিম গ্রামের চাষিদের ধৈর্য ধরে বোঝাল, শ্রেণীসংগ্রাম কোনভাবেই পরিহার করা হয়নি। সর্বহারার হাতে ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখতে গেলে আসল কাজ হল কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সেই সংগ্রামের লক্ষ্য গ্রামে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওয়ার্কটিমের উদ্যোগে লিউ শাও চি–র একটা কুশপুত্তলিকা তৈরি করা পোড়ানো হল। গ্রামের লোকেদের বলা হল, 'একনম্বর পুঁজিবাদের পথিক'–এর এই পুত্তলিকাকে আপনারা প্রহার করুন। কিংফা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে লিউয়ের কুশপুত্তলিকাকে ক্রুদ্ধভাবে লাঠিপেটা করল।

পরের সপ্তাহগুলোতে কিংফা কাজেকর্মে, টিম এবং ব্রিগেডের ক্যাডারদের সঙ্গে উষ্ণ ব্যবহারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রাজনৈতিক অধিবেশনগুলোতে এগিয়ে এসে সে উপযুক্ত শ্লোগানগুলো দিতে থাকল। সে সরকারিভাবেই একটা মডেল হয়ে উঠল। জেলায় অনেক ক্যাডার চার–সংশোধন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা শ্রেণী–শোধন অভিযানের রাজনৈতিক গোলমালে অপদস্থ হয়ে গুমরে গিয়েছিল। কিন্তু কিংফা একেবারে অন্যরকম। তাকে দৃষ্টান্ত অনুতপ্ত ক্যাডার হিসেবে কমিউন সেন্টারে এবং অন্য এক জেলার সদরে সাধারণ সভায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। সে প্রত্যেক সভায় স্বীকারোক্তি করে কেঁদে ফেলত। পার্টির নেতৃত্ব অনুসন্ধান করে দেখল, তাকে পার্টির সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়নি, পরীক্ষামূলক স্তরে রাখা হয়েছে।

কিংফা ছাড়া পাওয়ার দু'সপ্তাহ পরে প্রায় দশ মাস বন্দী থাকার পর স্টকি ওয়াঙ ও দেঙকে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির পর মুক্তি দেওয়া হল। তবে ওদের জনসাধারণের নজরদারিতে রাখা হল। তবে তাদের সমস্ত নথিপত্র পার্টির কাছে থাকায় ফের কোন নতুন অভিযানে ফেঁসে যাওয়ার ভয় থেকেই গেল। পিকিংয়ের নেতারাও বুঝতে পারল, লক্ষ লক্ষ ক্যাডার যারা আক্রমণের মুখে পড়েছিল, তাদের ভয় এবং ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে। তাই তারা নির্দেশ পাঠাল, শ্রেণী–শোধন অভিযানের সমস্ত দলিলপত্র প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হোক। ওয়ার্কটিমের প্রধান লঙইয়ংকে আলাদা করে ডেকে তার আত্মসংযম ও নমনীয়তার অভাব এবং 'যুদ্ধবাজ প্রভুদের মতো কাজের পদ্ধতি' শোধরাতে বলল। সেও বুঝতে পারল, একটা সমঝোতার মনোভাব নিতে হবে।

কমিউনের প্রশাসন গ্রামের ব্যাপারে নজর রাখল। পরের বছর কিংফা এবং তার বন্ধুদের আর একবার গ্রামের ব্যাপারে তারা যুক্ত হতে দিল। কমিউনের পার্টি সেক্রেটারির সাংস্কৃতিক বিপ্লবে পতন হয়েছিল। তাঁকে তাঁর পদে ফিরিয়ে আনা হল। এক বছর না কাটতেই কিংফাকে পার্টির মধ্যে ফিরিয়ে আনা হল। এর পরপরই ত্রিশজন পার্টি সদস্যের মধ্যে গোপন ব্যালটে নতুন শাখা কমিটি নির্বাচন করা হল। পুরনো পার্টি সদস্যের অনেকেই সাতজনের কমিটির সদস্য পদে কিংফাকে সমর্থন করল। কারণ তারা জানত, গ্রামে কিংফার মতো কর্মদক্ষতাসম্পন্ন ক্যাডার যথেষ্ট নেই।

কিংফা বিপ্লবী কমিটিতে আসার পর ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে 'আরও বৃহত্তর বিজয় অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও' কর্মসূচির সময় গ্রামের সকল মানুষের এক সভায় মঞ্চে উঠে কিংফা এবং লঙইয়ং হাত মিলিয়ে নিল। তারা দুজনেই নিজেদের পুরনো ঝগড়া ও রেষারেষি স্বীকার করে নিল এবং গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের সেবায় একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করল।

চেন গ্রামে বিবাহ বিপ্লব

চীনা চাষিরা বরাবর নিজেদের পারিবারিক পরম্পরা বজায় রাখতে পুত্র সন্তান এবং নাতি থাকার বিষয়টাকে অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এসেছে। এর অন্যথা হলে তারা নিজেদের পূর্বপুরুষের কাছে একেবারে অযোগ্য সন্তান হিসেবে নিজেদের মনে করেছে। কন্যা সন্তান থাকার গুরুত্ব নেহাতই গৌণ। প্রবচন রয়েছে, 'মেয়ের বিয়ে হলে তো সে পরের ঘরে চলে যাবে'। বিবাহিত মেয়ের গতর বা উপার্জন কোনটার ওপর আর বাবা–মায়ের দাবি থাকে না। সেই মেয়ে সন্তান প্রসব করলে তার স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। পুরনো সময়ে পুত্র–সন্তানের অগ্রাধিকার এত প্রবল ছিল, কঠিন দারিদ্রের সময় গরিব পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ভালো খাবার দেওয়া হত। অবস্থা সঙ্গীন হলে কখনও কখনও এমনকী নতুন জন্মানো মেয়ের মৃত্যু চাওয়া হত। ১৯৫০–এর দশকেও এই গরিব চাষি মনোবৃত্তি টিকে ছিল।

১৯৫৬ সালে ইয়াংসি নদী–উপত্যকায় একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, পাঁচবছরের নিচে ১১৩ জন ছেলে প্রতি ৬০ জন মেয়ে রয়েছে। ১৯৩৫ সালে ওই গ্রামে একই সমীক্ষা করা হয়েছিল। তখন এই ভারসাম্যহীনতা এত মারাত্মক ছিল না।

চেন গ্রামের চারপাশে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যার এই ভারসাম্যহীনতা ১৯৭০–এর দশকেও টের পাওয়া যেত। ফলে বিয়ের পাত্রী পাওয়া যথেষ্ট চিন্তার বিষয় ছিল। অন্য গ্রামের মতো চেন গ্রামেও একজন চেন অন্য চেনকে বিয়ে করা — যত দূর সম্পর্কই হোক না কেন — নিষিদ্ধ ছিল। এটা করলে তা অবৈধ যৌন সম্পর্ক হিসেবে গণ্য হত। বিপ্লবের আগে, চেনদের কূল–আইনে চেনদের পারস্পরিক যৌন আচারের জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করে নেওয়া হত এবং তাকে কূল ও গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। তাই সব মেয়েদের গ্রামের বাইরে বিয়ে দেওয়া হত, বৌয়েরাও আসত অন্য কূলের গ্রাম থেকে। বিভিন্ন কুল–কৌমের মধ্যে

এইভাবে বৈবাহিক জোট গড়ে উঠত। বিপ্লবের পরে পুরুষানুক্রমিক বিবাহ–রীতি সংরক্ষিত হল। জেলার অন্য গ্রাম চেন মেয়েদের বিয়ে করে নিয়ে যেত, কিন্তু বহু চেন নিজেদের ছেলের জন্য পাত্রী পেত না।

জাতীয় মান অনুযায়ী চেন গ্রাম গরিব না হলেও আশপাশের বেশিরভাগ গ্রামের তুলনায় তারা গরিব ছিল। চেনরা অবস্থাপন্ন অন্য গ্রামের পরিবারগুলোর সঙ্গে পাত্রীর দর মেটানোর প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। বিপ্লবের আগে পাত্রীরা যে যৌতুক নিয়ে স্বামীর ঘরে আসত সাধারণত পাত্রীর দর মেটাতে সেটা দিয়েই পুষিয়ে যেত। কিন্তু বিপ্লবের পরে যুবতী মেয়েরা মাঠের কাজে পূর্ণ–সময় শ্রম দিত। ফলে তাদের অর্থনৈতিক মূল্য বেড়ে গেল। গুয়াঙদঙ প্রদেশের বেশিরভাগ জায়গায় পাত্রীর দর বেড়ে গেল, কিন্তু পাত্রীর বাড়ি থেকে যৌতুক নিয়ে আসা বন্ধ হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভূমি সংস্কারের ফলে চেন গ্রামের সমস্যাটা অনেক গুণ বেড়ে গেল। ভূমি সংস্কারের আগে সব চেনরাই বউ পেয়ে যেত। কাছাকাছি তুলনামূলক সমৃদ্ধ নদীর চরের গ্রামগুলোতে কিছু ভাড়াটে পরিবার ছিল। এদের অবস্থা চেনদের থেকেও খারাপ ছিল। প্রবাদ ছিল, 'বাঁশের দরজার জন্য বাঁশের দরজা, কাঠের দরজার জন্য কাঠের দরজা' মিলত। যদিও এক্ষেত্রে মিথ্যা কথাও চালু ছিল। যে ঘটকরা দু'পক্ষের মধ্যে ঘটকালি করত, তারা প্রায়শই মিলিয়ে দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলত। যাই হোক, ভূমি সংস্কারের ফলে সমৃদ্ধ গ্রামগুলোতে গরিব পরিবারগুলোর অবস্থা চেন গ্রামের তুলনায় ভালো হয়ে গেল। ক্যান্টন থেকে প্রেরিত যুবকরা যখন ১৯৬৪ সালে গ্রামে এল, তখন ত্রিশ বছরের ওপর ২০–৩০ জন চেন পুরুষ অবিবাহিত রয়েছে। তাদের আর বিয়ে হওয়ার আশাও ছিল না।

বিয়ে না হলে কেবল পুত্র সন্তান মিলবে না, তাই নয়। তাদের বুড়ো বয়সে ভোগ পোয়াতে হবে। যদিও উৎপাদন টিম আইন অনুযায়ী অভাবী সন্তানহীনদের খাবার, আশ্রয়, জামাকাপড় এবং কফিনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু সেটা একেবারে সামান্য। টিমের অন্য সদস্যরা এই ব্যবস্থাটাকে অবাঞ্ছিত মনে করত। তাই পুত্রের আর্থিক মদত ছাড়া বার্ধক্য মানে ছিল আতঙ্কের বিষয়।

বউ পাওয়ার তাগিদ থেকে এবং এর মাধ্যমে পুত্র–সন্তান লাভের তাড়নায় বহু চেন একটা বিবাহ–বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। এর আগে ১৯৫৮ সালে 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া'র আসন্ন স্বর্ণযুগের তাৎক্ষণিক হাওয়ায় ১২ জন চেন যুবক গ্রামের মেয়েকেই বিয়ে করে ফেলে। এদের অধিকাংশ ছিল যুব ক্যাডার, পার্টি বা কমিউনিস্ট ইউথ লিগের সদস্য। সর্বত্রই প্রাচীন রীতিরেওয়াজ ভাঙা হচ্ছিল। এরাও ভাবল কুলগত সামাজিক নিষেধকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। সকলের জন্য ক্যান্টিনের খাবার চালু হওয়ায় পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মানে সাময়িক সমতা এসেছিল, দারিদ্র আর পাত্রী জোগাড়ে বাধা হচ্ছিল না। কয়েকজন কর্মী নিজেদের মধ্যে ভালোবেসে বিয়ে করল। অন্যরা যুবতীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করল। কারণ সেই অভিভাবকেরাও একজন উঠতি গ্রাম্য ক্যাডারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে ব্যক্তিগত সুবিধা হতে পারে বলে মনে করল। সম্পত্তির বদলে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাই বিয়ের পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেল।

কিন্তু অচিরেই 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া' ভেস্তে গেল, প্রাচীন বিশ্বাস আর রেওয়াজ আবার গেঁড়ে বসল। একই গ্রামীণ বংশের মধ্যে বিয়ে আবার অবৈধ বলে গণ্য হল। যদিও দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে চাষিরা মিষ্টি আলু ব্যবহার করে অন্য গ্রাম থেকে পাত্রী জুটিয়েছিল। এরপরে তারা আর পাত্রীর দর মেটাতে পারত না। 'চার সাফাই' অভিযানে ওয়ার্কটিম একই বংশের মধ্যে বিয়ের নিষেধ ফের চালু হওয়া নিয়ে সমালোচনা করে। এই অভিযানের শেষের দিকে কিছু চেন সাড়া দেয়। তাদের ছেলেদের পাত্রী পাওয়া নিয়ে আশঙ্কাই তাদের এই নিষেধের বেড়া ভাঙতে উৎসাহী করে। ১৯৬৬ সাল নাগাদ কিছু অভিভাবক বলতে শুরু করে, গ্রামের মেয়েরা যদি বিয়ে করে গ্রামেই থেকে যায়, তাহলে গ্রাম লাভবান হবে। এইসব পরিবার গ্রামের মহিলা সমিতিকে ঘরে ঘরে গিয়ে মায়েদের বোঝানোর জন্য কাজে লাগায়। সমিতি মায়েদের বলে, কেন তোমরা মেয়েকে সম্পূর্ণ অজানা গ্রামে অচেনা পরিবারে ঠেলে দেবে? মেয়েদের অভিভাবকেরাও দেখল, এটা ভেবে দেখলে তাদের বাড়তি লাভ রয়েছে। মেয়ের পরিবার বিয়ে হয়ে গ্রামে থাকলে বিবাহিত ছেলের পরিবারের পাশাপাশি আর একটা পরিবারকে পাশে পাওয়া যাবে। মায়ের অসুখ করলে বিবাহিতা মেয়ে শুনে দৌড়ে আসতে পারবে। যদিও ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য সম্পর্কে পুরনো ধারণা পাল্টাল না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই চেন গ্রামের মধ্যেই বিয়ের সংখ্যা মোট বিয়ের ৭০–৮০% হয়ে গেল।

এই বিবাহ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়লেও গুয়াঙদঙ প্রদেশের সর্বত্র তা একরকম ছিল না। ১৯৭০–এর দশকের মাঝামাঝি ৫১টি গ্রামের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪৫% গ্রামে বংশের মধ্যে বিয়ের প্রাচীন নিষেধের প্রথা ভেঙেছে। চেন গ্রামের যে মেয়েরা আরও ভালোভাবে থাকতে চাইত, তারা অন্য অবস্থাপন্ন গ্রামে বিয়ে করে চলে যেত। ছেলেদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ছিল উল্টো। স্থানীয় প্রতিযোগিতায় যারা বউ জোটাতে পারত না, তারা যেত অন্য গ্রামে। ১৯৭০–এর দশকের গোড়ায় অনেক দূরে গিয়ে জেলার অপর প্রান্তে হাক্কা কৌমের মধ্যে কয়েকজন চেন বিয়ে করেছিল। চীনের সমাজ ব্যবস্থায় হাক্কা হল এই প্রদেশের দরিদ্রতম কয়েকটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা। ক্যান্টন ভাষাভাষিদের সঙ্গে এদের পুরনো ঝগড়া রয়েছে। কিন্তু একবার সম্পর্ক তৈরি হতেই নতুন হাক্কা বউয়েরা এসে ঘটকালি করে আরও কিছু চেন যুবককে ওখানে বিয়ে দিল। ফলে সেইদিক থেকেও পুরনো রীতি ভেঙে গেল। চীনে পাত্রীর দর দিয়ে পাত্রের পরিবারের পাত্রী এবং তার শ্রমের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বোঝা যায়। এখন আর মেয়ের পরিবারের সম্পূর্ণ আর্থিক ক্ষতি বলা যায় না। ফলে পাত্রের পরিবার পাত্রীর দর সেই যুক্তিতে কমাতে চায়। মেয়ের অভিভাবকেরাও বেশি দর চাইলে বিয়ের পরে সেই মেয়ের সেবা আশা করতে পারে না। গ্রামের মধ্যে বিয়ে চালু হওয়ার আগে পাত্রীর দর ছিল ১০০০ ইউয়ান বা তারও বেশি। কয়েক বছরের মধ্যে তা কমে ১০০ থেকে ৩০০ ইউয়ান দাঁড়িয়েছে।

রোমান্টিকতা বনাম বাস্তব বুদ্ধি

অতীতে চেন যুবক–যুবতীদের বিয়ের সঙ্গী পছন্দের ব্যাপারে নিজেদের কোন বক্তব্য থাকত না। বাবা–মায়েরা সাধারণত ঘটকের মাধ্যমে ব্যবস্থা করত। কিন্তু এখন গ্রামের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে চালু হওয়ায় নিজেরা দেখাসাক্ষাৎ করে সঙ্গী পছন্দ করা শুরু হল। এ ব্যাপারে চেন গ্রাম আশপাশের গ্রামের থেকে একটু সেকেলে ছিল। বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা অন্য গ্রামে চালু ছিল। চেন গ্রামে এবার সেটা শুরু হল। একজন বালক বা বালিকা (বিয়ের আগে বছর কুড়ি বয়সের ছেলেমেয়েদের চেনরা এই নামেই ডাকত) চলতে–ফিরতে ভালো লেগে গেলে ছেলেটি বাবামায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তৃতীয় কাউকে দিয়ে কথাটা পাড়ত। মেয়েটি রাজি হলে ছেলেটি ওর বাড়িতে গিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করত। এইভাবে বিয়ের আলাপটা এগোত। পারস্পরিক প্রেমঘটিত ব্যাপার থাকলেও সাধারণত বিয়েতে এগোনোর আগে অভিভাবকদের অনুমোদন লাগত। গ্রামাঞ্চলে তখনও জীবনযাত্রা এত কঠোর ছিল, একটা সারা জীবনের দায় নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা–অসুবিধার হিসেবনিকেশ করে তবে বিয়ে পাকা করা যেত। তাছাড়া, ছেলেদের জন্য বাবা–মায়ের অনুমতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জরুরি ছিল, কারণ বিয়ের খরচ

তারাই জোগাত। মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলের বাড়ির অবস্থা যেমন বুঝে নিতে হত, তেমন বুঝতে হত ছেলেটির পরিবার ভালো শ্রেণীভুক্ত কিনা। শ্রেণীর পরিচয় পুরুষদের মধ্য থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত। বিয়ের পর মেয়েদের ছেলেপুলে হলে তার শ্রেণী পরিচয় আসবে বাবার দিক থেকে।

সাধারণত চাষিরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাইত। কারণ তার খাটবার ক্ষমতা থাকতে থাকতেই যাতে ছেলেমেয়েরা খাটবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বছর কুড়ি পেরোতেই বিয়ে করে বাচ্চা হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকত। মেয়েদের দিক থেকেও কেউ সাধারণত ত্রিশের ওপরে ছেলেদের বিয়ে করতে চাইত না। তারা চাইত পাত্রের বাড়ির লোক নববিবাহিতদের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করবে। একটা আলাদা নতুন ঘর করতে ১০০০ থেকে ২০০০ ইউয়ান খরচ পড়ত। সেটা জমাতে চাষিদের কয়েক বছর লেগে যেত। বিবাহযোগ্য ছেলের জন্য আলাদা ঘরের অর্থ জোগাতে চাষিরা উৎপাদন টিমের কাজের বাইরে পরিবারের নিজস্ব শুয়োর–মুরগি পালন, ঘাস কেটে বিক্রি, ব্যক্তিগত অথবা পতিত জমিতে সবজি ফলানোর ওপর জোর দিত। অবশ্য কোন কোন সময় মেয়ের বিয়ে দিয়েও পাত্রীর দর বাবদ কিছু অর্থের আমদানি হত। এসব জোগাড় করতে ছেলের বাপের সময় লেগে যেত। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগে থেকে বিয়ের কথা পাকা করে রাখা হত। ১৯৭০–এর দশকের মাঝামাঝি চেন গ্রামে পাত্রদের বিয়ের গড় বয়স ছিল ২৪ আর পাত্রীদের ২০–২১। আগের দিনে বিয়ে ভেঙে গেলে কিছু করার থাকত না। কারণ বিয়ে হত গাঁয়ের বাইরে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে, এমনকী একই উৎপাদন টিমের মধ্যে বিয়ে চালু হওয়ায় (এখন চেনদের একই বংশ বা কুলের শাখার মধ্যেও বিয়ে হতে শুরু করল) বিয়ে ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও ঝগড়াঝাটি শুরু হল।

বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তুলকালাম

১৯৬২ সালে চেন গ্রামে পাঁচটা উৎপাদন টিম ভাগ করে দশটা টিম তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৬৯–এ 'তিন আনুগত্য'–র ঝঞ্ঝাটের সময় কমিউন থেকে নির্দেশ এল, দশটা টিম না রেখে পাঁচটা করে ফেলো। গ্রামে চাষের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা হচ্ছিল। কিন্তু সবচাইতে সমৃদ্ধ ৭ ও ৮ নং টিম প্রথমে এতে রাজি হল না, এই দুই টিমের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল। দুই টিমেরই প্রধান দুজন ছিল গ্রামের মধ্যে চাষের কাজ পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এর মধ্যে ৭ নং টিমের প্রধান চেন লৌসুন ছিল এগিয়ে। সে এক অসাধারণ গরিব পরিবার থেকে এসেছিল। তাদের জমি বা অর্থ কিছুই ছিল না। অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে বড়ো হয়ে সে অন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে অস্থায়ী খেতমজুর হিসেবে কাজ করত। বিপ্লবের পর জমি আর ঘর পেয়ে পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই সে সমবায়ের এক সম্মানিত ক্যাডার হয়ে উঠল। তার বিয়ে করার মতো সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু তার যখন ত্রিশের কোঠায় বয়স, 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া'র পর্বে সে গ্রামের পুরনো সংস্কার ভেঙে গ্রামেরই এক অনাথ মহিলাকে বিয়ে করল। বিয়ের পর তার বউয়ের সাতটা বাচ্চা হল। তার মধ্যে ছ'টা বাঁচল, সবগুলোই মেয়ে। সরকারের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে অবহেলা করলেও গ্রামের কেউ তাকে তেমন সমালোচনা করল না। এত বড়ো পরিবার, এতগুলো পেট ভরাতে তাকে উৎপাদন টিম থেকে খাদ্যশস্য ধার নিতে হত। মেয়েরা একটু বড়ো হওয়ার পরও সে ওদের লেখাপড়া করাতে পারল না। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা ঘরে এল। লৌসুন বলল, মেয়েদের ঘরের কাজে সাহায্য করতে হয়। শিক্ষকরা বলল, একবছর পর অন্তত বড়ো মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হবে। ওর বউ ছিল খিটখিটে মেজাজের আর অলস। তার ওপর ওর বরাবরের হাতটানও ছিল। ১৯৬৪ সালে একবার সে টিমের কিছু আখ চুরি করেছিল। ধরা পড়তে তার স্বামীকে কয়েকশ' ইউয়ান জরিমানা গুণতে হল। লৌসুনকে কয়েকবার পার্টির সদস্য হওয়ার আহ্বান করা সত্ত্বেও সে হয়নি।

লৌসুনের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হল ৮ নং টিমের প্রধান, যাকে লোকে 'অক্লান্ত বুড়ো' বলে ডাকত। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েও কঠিন পরিশ্রমের ক্ষমতার জন্য তার গর্ব ছিল। সে টিমের অন্যদের যন্ত্রের মতো খাটিয়ে মারত। টিমের সভা ডাকলে দু'তিন ঘন্টা অন্যদের আটকে রাখত। তবু অন্যরা তাকেই বারবার টিমের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করত, কেননা সে ছিল এক দক্ষ পরিকল্পনাকারী। লৌসুনের টিমের মতো না হলেও উৎপাদনে অক্লান্ত বুড়োর টিম বেশ ভালো ফল দেখাত।

৭ ও ৮ নং টিমকে জুড়ে দেওয়া হল। পুরনো টিম–প্রধানদের ক্ষমতার ব্যাপারটা মাথায় রেখে লঙইয়ং একটা নতুন সাংগঠনিক কাঠামো খাড়া করল। নতুন ৪নং টিমে অক্লান্ত বুড়োকে রাজনীতির প্রধান ভারপ্রাপ্ত এবং লৌসুনকে উৎপাদনের প্রধান ভারপ্রাপ্ত করা হল। চাষের পরিকল্পনাকারী হিসেবে লৌসুনের যোগ্যতর অবস্থান নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না; অক্লান্ত বুড়োর অহঙ্কারকেও রক্ষা করা হল এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, মতাদর্শের স্থান অর্থনৈতিক পরিচালনের থেকে আগে, অতএব বুড়ো সবার আগে।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থাটা প্রথমে কাজ করল না। দুজনের মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকল। যদিও দুজনেই উৎপাদন ঠিক রাখতে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই এক সম্ভাব্য পাত্রীকে নিয়ে ফের ঝামেলা লেগে গেল।

অক্লান্ত বুড়োর একটা বছর পঁচিশের ছেলে ছিল। ছেলেটা ছিল অলস। সবসময় ওর গায়েগতরে ব্যথা লেগেই থাকত। ওর বিয়ে–থা নিয়ে বুড়োর একটা উদ্বেগ ছিল। অন্যদিকে ছোটো শালা হেইঝাই–কে লৌসুন ছেলের মতো স্নেহ করত। এই দুই যুবকের বাগদত্তা নিয়ে চেন গ্রাম অশান্ত হয়ে উঠল।

অক্লান্ত বুড়োর পুরনো টিমে এক হতদরিদ্র বিধবা মায়ের ছোটো মেয়ে ছিল গ্রামের এক আকর্ষণীয় যুবতী। সে দেখতে শুনতে যত না দারুণ ছিল, তার চেয়ে ছিল কাজেকর্মে পটু। অবশ্য ঘটকালির আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এড়ানোর জন্য ছেলেদের সঙ্গে হেসে ছেনালি করত বলে তার একটা বদনামও ছিল। ১৯৬৮–তে অক্লান্ত বুড়োর ছেলে ওর প্রেমে পড়ল। বুড়ো এক ঘটককে পাঠাল সম্বন্ধের জন্য। মেয়েটির বিধবা মা এক ক্যাডারের ঘরে মেয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই মেয়ে আর মা ফের ভেবে দেখল, ছেলেটি অকর্মা। অতএব তারা সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়ার কথা জানাতেই অক্লান্ত বুড়ো খেপে গেল। এই ঘটনার ক'মাস পরেই ৭ ও ৮নং টিমের সংযুক্তি হয়েছিল।

এই বিধবার ননদ ছিল সেই লিলৌ, যার সঙ্গে শর্টির ভাবভালোবাসা নিয়ে গ্রামে সভা হয়েছিল। লিলৌ বিধবাকে পরামর্শ দিল, লৌসুনের ভাইপো হেইঝাই তার মেয়ের জন্য সুপাত্র। হেইঝাই ছিল কমিউনিস্ট ইয়ুথ লিগের সদস্য, পার্টিতে ঢোকার ভালো সুযোগ তার ছিল। ৭ নং টিমে সে ছিল গুদামরক্ষক। নবগঠিত ৪নং টিমেও সে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদটা পেল। দেখতে শুনতেও সে ভালোই ছিল। অতএব লিলৌ তার ঘটকের ভূমিকায় নেমে পড়ল। তাছাড়া সেও ওই নতুন টিমের সদস্য ছিল। সে দেখল, লৌসুনকে খুশি করতে পারলে সম্পর্কের সুবাদে টিমে সে হালকা কাজ পেয়ে যেতে পারে। অক্লান্ত বুড়োর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সে মোটেই আন্দাজ করতে পারেনি।

লিলৌয়ের মেয়ে পুমি সেইসময় গ্রামের মহিলা সমিতির প্রধান পদ পেয়েছিল। পুমির প্রেম হয়েছিল এমন একটি ছেলের সঙ্গে, যে ওই গ্রামের একমাত্র হাইস্কুল গ্রাজুয়েট। ছেলেটি মধ্য চাষির ছাপ থাকার অস্বস্তি কাটিয়ে সবে ব্রিগেডের নিচু স্তরের একটা পদ পেয়েছিল। এরপর সে পিএলএ–তেও

জায়গা পায়। পুমি ও লিলৌয়ের পরিবারের সঙ্গে ওর পরিবারের আসাযাওয়া শুরু হয়েছিল। আগেকার দিনে এত ঘনিষ্ঠ মহলে বিবাহ সংক্রান্ত মেলামেশা ছিল না। এখন সেটা চালু হওয়ায় উৎপাদন টিমের রাজনীতির মধ্যেও নতুন দলাদলি বেড়ে উঠল। প্রসঙ্গত, পুমির সম্বন্ধকারি এই ছেলেটির বাবা তার মায়ের ইচ্ছেতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল। ১৯৪৯–এর আগে ঘটা এই ধরনের দুই বিয়ে নিয়ে পরে স্থানীয় পার্টি কর্তৃত্ব আপত্তি করেনি। যাই হোক, দুই স্ত্রী পাশাপাশি আলাদা বাড়িতে তাদের বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে বাস করত। পড়শিরা এ নিয়ে কোন ঝামেলা টের পায়নি।

লৌসুনের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন এল তার শালা হেইঝাইয়ের মায়ের কাছ থেকে। গলাবাজির জন্য এই মহিলাকে সকলে গঙ বলে ডাকত। সেও ছিল ওই টিমের সদস্যা এবং বরাবর ওকে নিয়ে লৌসুনের মাথাব্যথা ছিল। গঙ লোকের ভুলত্রুটি নিয়ে নিন্দে করত। লৌসুন বলত, 'একটা লোকের চরিত্র পাল্টানো একটা পাহাড় সরানোর চেয়েও কঠিন'। টিমের সদস্যরা অবশ্য গঙের জন্য তাকেই দায়ী করত। এখন লিলৌ আর গঙ তার হয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। প্রথমে চাষিরা অনেকেই ভেবেছিল, লৌসুন করিৎকর্মা সংগঠক, ব্যাপারটা সামলে নেবে। কিন্তু ক্রমশই টিমের এক একজন তাদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত রেষারেষির জায়গা থেকে লৌসুন আর অক্লান্ত বুড়োর পক্ষে–বিপক্ষে ভাগ হয়ে গেল। বেশিরভাগ টিম–সদস্য অবশ্য নিজেদের মধ্যে লড়াই চাইছিল না। কেননা বিয়ে নিয়ে ঝামেলার অভিযোগ ব্রিগেডের কাছে গেলে তাদের 'মতাদর্শগতভাবে পিছিয়ে পড়া' বদনাম নিতে হবে।

এরপর টিমের গুদাম থেকে সামান্য কিছু চাল উধাও হল। টিম–সদস্য দুই ভাই — দুজনেই পার্টির সদস্য — বলল, হেইঝাইকে একটা বস্তা নিয়ে বিধবাটির ঘরের দিকে যেতে দেখা গেছে। হেইঝাই গুদামরক্ষক। ফলে গুজবটা ছড়িয়ে গেল।

অক্লান্ত বুড়ো এবং তার সঙ্গীরা প্রথমে এই কুৎসিত প্রচারে যোগ দেয়নি। কিন্তু আচমকা চারচোখো ঊ–এর কাছ থেকে অভিযোগটা এল। ক্যান্টন থেকে প্রেরিত যুবকদের মধ্যে এই ঊকে টিমের নতুন মাও চিন্তাধারা প্রচারক মনোনীত করা হয়েছিল। যেহেতু লৌসুনের বউয়ের চুরির অভ্যাস ছিল, তাই তার ভাই হেইঝাই চাল চুরি করেছে বলে সে দাবি করল। এবার অক্লান্ত বুড়োর সমর্থকেরাও ঊয়ের অভিযোগ নিয়ে মেতে উঠল। টিমের কাজেও দুই গোষ্ঠী পক্ষপাতিত্ব শুরু করে দিল। টিমের নেতৃত্ব চাষের কাজ আর ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারল না। চাষিরা দেরিতে কাজে আসতে শুরু করল, তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে বাড়ি চলে যেতে থাকল। ফলন কমে গেল। টিমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক চাষি পরিবারে ২০% কম খাদ্যশস্য বিতরণ হল। ১৯৭১–এ পরের বসন্তের চাষ মার খাওয়ার উপক্রম হল।

মধ্য–ষাটের দশকের ব্রিগেড নেতারা ৭ ও ৮ নং টিমকে 'মডেল' বলত। যখন 'তাচাই মজুরি ব্যবস্থা' একটা কর্মসূচি হিসেবে এল, অন্য টিমগুলো বলল, এটা করা যাবে না। ওই দুই টিমের উৎপাদনশীলতা বেশি থাকায় ব্রিগেডের ঘনিষ্ঠ এবং পারদর্শী হিসেবে তারা ওই কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। দুই টিমেই পাঁচজন করে পার্টির সদস্য ছিল। কিন্তু নবগঠিত ৪ নং টিম নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। লঙইয়ং ওই দুই পুরনো টিমেরই একটিতে ছিল। কিন্তু সে টিমের ভিতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। ১৯৭০–এর দশকের শেষের দিকে জাতীয় স্তরে 'এক আঘাত, তিন বিরোধিতা' নামের এক কর্মসূচি এসেছিল। আগের অভিযানে বাড়াবাড়ি হওয়ায় লঙইয়ং সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবারের অভিযান নিয়ে সে ধন্দে পড়েছিল। এই নতুন সমস্যাটা এসে পড়ায় তার মাথায় একটা মতলব এল। সে 'এক আঘাত' অভিযানে চারচোখো ঊকে পাকড়াও করার পরিকল্পনা স্থির করল। লৌসুন আর অক্লান্ত বুড়ো দুজনেই সম্মানিত ও মূল্যবান ক্যাডার। কিন্তু ঊ বাইরে থেকে এসেছে, তার সর্বহারা শ্রেণী পরিচয়ও নেই। এছাড়া, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সে ক্যান্টনে পালিয়ে গিয়েছিল এবং কিছু হঠকারি কাজও করেছে। অতএব দিনক্ষণ ঠিক করে জননিরাপত্তা কমিটি সশস্ত্র রক্ষীদের নিয়ে ঊকে এক সন্ধ্যায় তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল। এবার ঊকে হেনস্থা করার জন্য লঙইয়ং অন্য দুই বহিরাগত যুবক স্টকি ওয়াঙ ও ঝাও–এর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইল। সংগ্রাম অধিবেশন ডাকা হল। সেখানে বাধ্য হয়ে স্টকি বলল, 'ঊয়ের ঠাকুর্দা ছিল একজন জমিদার ... যেহেতু সে এক জমিদারের ঘরে বড়ো হয়েছে, স্বেচ্ছামূলকভাবে ঊ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে।' যারা শুনছিল সকলে এবং ব্রিগেডের ক্যাডাররাও অবাক হয়ে গেল।

স্টকি এই ধরনের অভিযোগ তোলায় শহর থেকে প্রেরিত সমস্ত যুবকই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেইভাবে দেখলে তাদের সবারই ঠাকুর্দা বা ঠাকুর্দার বাবা জমিদার বা 'খারাপ শ্রেণীর লোক' ছিল। স্টকিও মন থেকে ঊকে এইভাবে ফাঁসাতে চায়নি। সেও সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে রইল। দু'বছর পর সে গ্রাম থেকে পালিয়ে হঙকঙে চলে গেল। বন্ধু ঊয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

ঊকে এবার গোয়ালঘরে পাঠানো হল। চেয়ারম্যান মাও এবং ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াওকে নিন্দা করার জন্য তার রিপোর্ট পার্টির ওপরমহলে পাঠানো হল। কিন্তু এতে ফল হল। ৪নং টিমের দুই প্রধান অস্বস্তি নিয়েই সন্ধি করে নিল এবং বসন্তের রোয়ার কাজ নির্বিঘ্নেই মিটল। এদিকে শীঘ্রই অক্লান্ত বুড়ো পাশের এক কমিউনে ছেলের জন্য এক পাত্রী পেয়ে গেল। সে মনেপ্রাণে হেইঝাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ তুলে নিল। ফলে হেইঝাই অনায়াসে পার্টিতে সদস্যপদ পেল।

যদিও নেতৃত্ব নিয়ে এই দুজনের বিরোধ পুরো মেটেনি। টিমের কমিটি ঠান্ডাভাবেই অক্লান্ত বুড়োকে মেনে চলত। লৌসুন শেষপর্যন্ত দায়িত্ব থেকে সরে যেতে চাইল। ব্রিগেডের নেতারা তাকে নিরস্ত করল। ১৯৭২ সালে ব্রিগেডের ইট ফ্যাকট্রির প্রসার ঘটানো হল। সেখানে একজন সর্বক্ষণের ম্যানেজার দরকার হল। লৌসুনকে সেই পদটা নিতে বলা হল। উৎপাদন টিম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পেরে সে খুবই খুশি হল।

[ক্রমশ]

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন।

একবছরের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক–চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com.

চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

রবার্ট ওয়েল

রবার্ট ওয়েল কলকাতায় এসে ২৪ ডিসেম্বর ২০০৯ ইন্দুমতী সভাঘরে এক বক্তৃতা দেন। এই প্রবন্ধের শিরোনামই ছিল ওই বক্তৃতার বিষয়। বক্তৃতায় তিনি ১৯২০–র দশক থেকে আজ পর্যন্ত চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা নিয়ে বলেছিলেন। প্রাথমিক বক্তব্য পেশ করার পর উপস্থিত শ্রোতারা তাঁকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নের পরিধি অবশ্য 'শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' থেকে ছাপিয়ে অন্যান্য নানাদিকেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল; যেমন, চীনের পুঁজিবাদের গতিপ্রকৃতি, তিব্বতীদের অবস্থা, অভিবাসন, ইনফর্মাল সেক্টরের আয়তন, স্পেশাল ইকনমিক জোন, ভূমি ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ইত্যাদি। ওই সভায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এত বড়ো পরিধিতে উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে অনেকটাই সম্ভব হয়নি। পরে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে প্রশ্নগুলো লিখিতভাবে পাঠানো হয় এবং সেগুলোর জবাব সহ কলকাতার বক্তৃতার একটি লিখিত রূপ পাঠানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। তিনি জানান, সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত নন। তবে একটা লিখিত বক্তব্যের খসড়া তিনি আমাদের পাঠাবেন। অবশেষে ৯ জুন ২০১০ তিনি সেটি পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, "এই খসড়ায় আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। ... দয়া করে আপনারা কী ভাবছেন আমাকে জানান। আপনাদের দিক থেকে নতুন কোন ভাবনাকে আমি স্বাগত জানাই। ভারতে বর্তমানে কী ঘটে চলেছে, এখানে খুব সামান্য নির্ভরযোগ্য তথ্যই আমরা পাই।" আমরা তাঁর এই খসড়া আকারে লেখাটির বাংলা তর্জমা করে এখানে প্রকাশ করলাম। আশা করি, যাঁরা ওই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং যাঁরা বর্তমান প্রবন্ধটির উৎসাহী পাঠক, তাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন। আমরা সেই প্রতিক্রিয়া রবার্ট ওয়েলকে পাঠানোর চেষ্টা করব। এই প্রবন্ধের বাংলা তর্জমা করেছেন তমাল ভৌমিক।

চীনের বর্তমান পুঁজিবাদী গতির মূলে রয়েছে সেই ভিত্তি, যা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ গোলার্ধে ভারত সহ অন্য দেশগুলোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে চীনের অভিজ্ঞতার মৌলিক তফাৎ এখানেই; বিশেষত চীনের শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার তফাতের কথাটা খাটে। চীনাদের ইতিহাস মূলগতভাবে আলাদা। এর মধ্যে অন্যতম হল এক বিকল্প সমাজতান্ত্রিক পথের উত্তরাধিকার। এখনও তাদের বর্তমান সংগঠনগুলোতে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই বিষয়টার উল্লেখ ব্যতীত, চীন ও ভারত যে আলাদা আলাদা ঐতিহাসিক পথ গ্রহণ করেছে এবং এই দুটি দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে তফাৎ রয়ে গেছে, তা বোঝা যাবে না। ১৯৭০–এর দশকের শেষে দেঙ শিয়াও পিং যে 'বাজার সংস্কার' চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর তিরিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। কিন্তু এখনও সমাজতন্ত্রের যে দিকগুলো প্রভাব ফেলে চলেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হল চীনা জমি–মালিকানা ব্যবস্থার বিপ্লবী রূপান্তর। চীনে এখনও গ্রামাঞ্চলেই অধিকাংশ মানুষ বাস করে এবং জমিদারশ্রেণীর শাসনের অবসান ও চাষিদের জমির নিরাপত্তা দানই সেখানে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি এই বিষয়টাই ভারত ও অন্য বেশিরভাগ দেশের সঙ্গে চীনের অভিজ্ঞতার ফারাক টেনে দেয়।

মাও সেতুঙের নেতৃত্বে ১৯২০–র দশকে যে বিপ্লবী ভূমি সংস্কার শুরু হয়েছিল এবং যা ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টদের জয়লাভের পর জাতীয়ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিল, একমাত্র সেটাই জমি ও প্রয়োজনীয় কৃষি–যন্ত্রপাতিতে প্রত্যেক চীনা কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করেছিল। বিপ্লবের ফলে যা যা অর্জিত হয়েছিল, তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন। কিন্তু ভূমি সংস্কারের প্রথম পর্যায়ের পরে ছোটো, বিশেষত গরিব পরিবারের হাতে থাকা খামারগুলি তাদের পরিবারের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। তাই ধাপে ধাপে এগুলোকে কৃষি সমবায়ে এবং পরে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে 'সামনের দিকে লম্বা লাফ' (গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড)–এর সময়ে কমিউনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। এইভাবে জমির ওপর অধিকার যৌথ রূপ পায়। ব্যক্তিগত জমির স্বত্বের বদলে গ্রামীণ সমবায়গুলোর একত্রিকরণ হয়েছিল। সেখানে জমিতে একসঙ্গে চাষের কাজ হত এবং কৃষকেরা তাদের কাজের 'ওয়ার্কপয়েন্ট' হিসেবে কৃষি–উৎপন্নের একটা অংশ পেত। কিন্তু কমিউনগুলো শুধুমাত্র উৎপাদনের সংগঠন থেকে অনেক বেশি কিছু ছিল। এগুলো সামগ্রিক একগুচ্ছ সামাজিক পরিষেবা ও নিরাপত্তা দিত, বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকল্যাণে এবং পাশাপাশি বড়ো বড়ো পরিকাঠামো ও পরিবেশগত প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে — যেমন সেচ ও নতুন কৃষিজমি তৈরি করার ক্ষেত্রে — একটা ভিত্তি গড়ে দিত।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা (SOE) এবং রাষ্ট্রের অধীনে থাকা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত শহুরে শ্রমিকেরাও একইরকমের কাজ ও বাসস্থানের নিরাপত্তা পেত এবং তাদের নিজ নিজ কাজের ইউনিটগুলোর পরিচালনায় অংশ নিত। সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল চীনা খামার, কারখানা এবং পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলো।

বিপ্লবের প্রথমদিককার এই সুফলগুলো আরও বিস্তৃত হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আরও বিকেন্দ্রীকরণের সময়ে। ওই কর্মসূচির পর্বকে একটা সর্বনাশগ্রস্ত দশক হিসেবে নাকচ করা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে এবং সেটাকে কেবল নেতিবাচক দৃষ্টিতেই বিচার করা হচ্ছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিপুল শক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিল। উৎপাদনের যে সামাজিকীকরণ ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছিল, তার আরও প্রসার, সামাজিক পরিষেবার বিস্তার এবং তলা থেকে সমাজের সংগঠনকে ওপরে তোলার মধ্য দিয়ে এটা ঘটেছিল। সর্বোপরি এই সময়ে দেখা গিয়েছিল শারীরিক ও মানসিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, সমস্তরকম সম্পদের ব্যাপক স্থানান্তর — শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষিত নয়াকুলীনদের (এলিট) থেকে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে, প্রবীণ থেকে নবীনের দিকে, পুরুষের থেকে মহিলাদের দিকে, অতীতকে দাসসুলভ মেনে নেওয়া থেকে বর্তমানকে অধিকার করার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নগ্নপদ চিকিৎসকদের মাধ্যমে — গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং নতুন নতুন বিদ্যালয় গড়ে তুলে এতদিন যাবৎ বঞ্চিত কৃষক পরিবারদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে এটা ঘটছিল। বিভিন্ন পেশার ওপর পাশ্চাত্য নির্ভর 'বিশেষজ্ঞ'–দের বেড়া ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও শিল্পীদের পাঠানো হয়েছিল অথবা তারা স্বেচ্ছায় গিয়েছিল। সেখানে তারা শ্রমজীবী মানুষের কাছে শিখেছিল, কীভাবে উৎপাদন করতে হয়, তারা পরস্পরের শিক্ষা বিনিময় করেছিল এবং জেনেছিল অতি সংখ্যাগরিষ্ঠ 'সাধারণ মানুষ'–এর জীবনটা কীরকম। পুরনো প্রথা ও মনোভাব, যেমন নয়াকৌলিন্য, সর্দারি ফলানো, পার্টির ক্যাডারদের দুর্নীতি, বয়স্কদের কর্তাগিরি এবং পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল; শ্রমিক–কৃষকের নতুন শক্তিকে 'একের মধ্যে তিন' নামক

কমিটিগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেখানে তারা পার্টির লোক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসকদের সঙ্গে একসাথে বৈঠক করত। অনেক কাজের জায়গায় (ওয়ার্ক ইউনিট) শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা আগের কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে নিজেরা বসেছিল। 'বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত' এবং 'জনগণের সেবা করো' — মাওয়ের এই ধারণাগুলো এই অভিযানকে পথ দেখিয়েছিল এবং সমগ্র সমাজের মনকে যেভাবে পাল্টে দিয়েছিল, তা আজও ছড়িয়ে আছে, এমনকী পরবর্তীকালে মাওয়ের নীতিগুলো উল্টে দেওয়ার পরেও।

এর ফলাফল হয়েছিল নাটকীয়। ১৯৪০–এর দশকে, ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্তির পরে ভারত ও চীনের ছবিটা ছিল প্রায় একইরকম দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু ১৯৭০–এর দশকের মাঝামাঝি যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরই ১৯৭৬–এ মাওয়ের মৃত্যু হল, তখন চীনাদের গড় আয়ু ছিল ষাটের কোঠায় আর ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল ৪৯–এর সামান্য বেশি। ১৯৮০–৮১–তে চীনে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ৬৭ আর ভারতে ১২২। সাক্ষরতাকে জুড়ে নিলে 'বাস্তব জীবনমানের সূচক' চীনে ছিল ১০০–তে ৬৭ আর ভারতে মাত্র ৪৪। প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানগুলোতে বিশ্বের দক্ষিণ অংশের অধিকাংশ দেশের তুলনায় চীন মধ্যবর্তী অথবা ধনী দেশগুলোর কাছাকাছি ছিল। এইসব উন্নতির ফলে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। যাই হোক, এসব সত্ত্বেও দারিদ্র, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, থেকে গিয়েছিল। এমনকী বিনাশমূলক সংগ্রামের বছরগুলোর অতি উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে এবং গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ডের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হিংসায় বিপুল সংখ্যক প্রাণের বিনিময়ে এইসব অগ্রগতি ঘটেছিল। অংশত এই উচ্চ মূল্য দিতে হওয়ার কারণেই মাওয়ের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, এমনকী শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল। বিশেষত যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রধানত কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি ও অন্যান্য কুকর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এবং পেশাজীবী ও ম্যানেজার–বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, তা ক্ষমতাশীল একাংশকে ক্রুদ্ধ করেছিল। ১৯৭৬ সালে মাওয়ের মৃত্যুর পর দু'বার পার্টি থেকে বিতাড়িত দেঙ শিয়াও পিংকে ঘিরে এই শক্তি জমাট বাঁধে এবং তাঁকে ক্ষমতা দখল করতে পথ করে দেয়। একে একমাত্র একটা শ্রেণীর অভ্যুত্থান মারফত ক্ষমতা দখল বলেই বর্ণনা করা যায়। তাঁর নেতৃত্বেই বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পথ দ্রুত পরিত্যাগ করা হল এবং চীন 'পুঁজিবাদী পথ' গ্রহণ করল, যে পথের বিরুদ্ধে মাও সবাইকে সতর্ক করেছিলেন এবং তা ঠেকানোর জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। 'সংস্কার' ও 'বিশ্বের কাছে দ্বার খুলে দেওয়া'র মধ্য দিয়ে দেঙ পুঁজিবাদী 'বিশ্বায়ন'–এর মধ্যে চীনা অর্থনীতি ও সমাজকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলেন।

এতৎসত্ত্বেও বরিস ইয়েলেৎসিন রাশিয়ায় যে 'শক থেরাপি' পদ্ধতি নিয়েছিলেন, তার তুলনায় চীনে দেঙের পদ্ধতি ছিল এক দীর্ঘ ও সতর্ক পথ ধরে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন — এর জন্য তিনি আভ্যন্তরীণ অ–সামাজিকীকরণ ও দেশের বাইরের পুনর্বিন্যাসের অনেকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে গেছেন।

প্রথম যে কর্মনীতি প্রয়োগ করা হয়, তা হল, কমিউনগুলোর অ–সমবেতকরণ, কমিউনগুলো সব ভেঙে দেওয়া। যদিও হিসেব বলছে, কমিউনের তিনভাগের একভাগ আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল আর একভাগ ভালোই চালানো যাচ্ছিল, শুধু তৃতীয় ভাগটিকে নিয়ে সমস্যা বাড়ছিল। এর বদলে ব্যক্তিগত পারিবারিক চুক্তির ব্যবস্থা নিয়ে আসা হল। এর মধ্য দিয়ে 'সংস্কার'–এর পেটি বুর্জোয়া ভিত্তি প্রতিফলিত হল, যাতে প্রত্যেক পরিবার নিজস্ব ছোটো জোতে চাষ করত।

এর ফলে বিশাল যে জমিগুলোয় সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করা হত, সেগুলো আবার ভেঙে — উইলিয়াম হিন্টনের ভাষায় — 'নুড্‌লের টুকরো' করে ফেলা হল আর সেচ ব্যবস্থা, জলাধার এবং অন্য পরিকাঠামো ও পরিবেশগত প্রকল্প, যেগুলো কমিউনের যৌথ শ্রমের ওপর নির্ভর করত, সেগুলো নষ্ট হতে শুরু করল। যত সামাজিক পরিষেবা ছিল, যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা একে একে ভেঙে ফেলা হল বা সেগুলোর বেসরকারিকরণ করা হল। যদিও বা সেগুলোর কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকল, তার খরচ চড়া হতে শুরু করল। পুরনো দিনের মতো আবার পুরুষদেরই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'পরিবারের কর্তা' মনে করতে থাকল, তাদের হাতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হল। এই ঘটনা মেয়েদের অধিকারের একটা গুরুতর পিছু হটা।

নতুন অর্থনৈতিক নীতিগুলো প্রথমদিকে গ্রামাঞ্চলে আয় বৃদ্ধি করেছিল। এর কারণ ছিল সরকারি অনুদান এবং খামারে উৎপন্ন ফসলের দর বাড়ানো। শহরাঞ্চলে কর্মোদ্যোগের (Township Enterprise) বৃদ্ধি ঘটেছিল। এর মূলে ছিল গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড। এগুলো বহু কৃষককে কাজ জোগাত, বিশেষত শীতের সময়ে যখন চাষের কাজ কম থাকে। এগুলো কৃষি খামারের বাইরেও কৃষকদের কিছু উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছিল, যার জন্য বড়ো শহরের তুলনায় কয়েক বছর তাদের উন্নতি বেশি হয়েছিল। গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই সব শ্রেণীর লোকের একাংশের এবং শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক লাভ হয়েছিল এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা বেশ ভালো মতো পূরণ হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের সময় যেসব যৌথ সঞ্চয় গড়ে তোলা হয়েছিল, সেখানে খাবলা মেরে অনেক কৃষক দ্রুত লাভ বাড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সর্বসাধারণের সম্পত্তির এরকম অপচয়ের ফলে 'এক বিরাট পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয় হারিয়ে গেল' — এই মন্তব্য করেছেন দেঙের সংস্কার কর্মসূচির এক সমালোচক। এই প্রাথমিক লাভের পরে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে একটা স্থবিরতার পর্যায় এল এবং নতুন করে আবার গ্রাম ও শহরের ফারাক বাড়তে থাকল; তা আজ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে। পুঁজিবাদী পথে চীনা সমাজ যত এগোতে শুরু করল, শহরগুলো অর্থনৈতিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠল আর কৃষক ও গ্রামীণ উদ্যোগপতিরা বিশাল বিশাল দেশীয় প্রতিযোগী এবং বিশ্ব জোড়া 'মুক্ত বাজার'–এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে গেল। বিশেষত ২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO–তে যোগ দেওয়ার পরে আমদানি করা খাদ্যদ্রব্যে চীন ভেসে গেল। ছোটো ছোটো জোত নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে না পারায় গ্রামাঞ্চলের অনেক কৃষক আবার গভীর দারিদ্রে ডুবে গেল। আজকাল এমন কথা প্রায়ই শোনা যায় যে চীনের গ্রামাঞ্চলে সংকট চলছে।

এর ফলে গ্রামাঞ্চলে দুরকম মেরুকরণ শুরু হল — এক, শ্রেণীগতভাবে এবং দুই, ভৌগোলিক সীমারেখায়। পরিবর্তিত অবস্থায় যেসব কৃষকরা কিছুটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিল, তাদের মধ্য থেকে একটা 'ধনী চাষি' স্তর গড়ে উঠল, যারা তাদের ভাগ্যহীন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে মাঝে মাঝে তাদেরকেই শ্রমিক হিসেবে জমিতে নিয়োগ করল। কৃষকদের শোষক হিসেবে এই যে একটা শ্রেণীর উত্থান হল, এদের আর একটা অংশ হল গ্রামীণ উদ্যোগপতিরা, যারা প্রায়শই দুর্নীতি পরায়ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এবং পার্টির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। শহরতলীর গ্রামগুলো, বিশেষত যেগুলো উপকূল অঞ্চলের বড়ো শহরগুলোর লাগোয়া, তারা উন্নয়নের বহুবিধ সুযোগ পেল, যা দেশের ভিতরকার অঞ্চলগুলো পেল না। এর ফলে ভৌগোলিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিভাজন সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সব মিলিয়ে চীনের গ্রামাঞ্চল পুরনো মান্দারিন–অধীনস্থ শ্রেণী কাঠামোর চেহারা ফিরে পেল — একদিকে মুষ্টিমেয় ধনী পরিবার,

রাষ্ট্র ও পার্টির মুখপাত্র, যাদের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা; অন্যদিকে বিশাল সংখ্যক কৃষক দেখতে পেল তাদের অবস্থা হয়ে উঠছে ক্রমশ আরও নড়বড়ে, নিরাপত্তাহীন ও ক্ষমতাহীন। কিন্তু এইরকম 'ছক উল্টে' যাওয়াতেও 'সংস্কার' সরাসরি বিপ্লবের আগেকার জমি–মালিকানা ব্যবস্থায় ফিরে গেল না। কৃষকেরা ব্যক্তিগতভাবে চাষ করলেও, তারা জমির যে অংশ চাষের জন্য পেল, তার মালিকানা গোটা গ্রামের সমবেত সাধারণের হাতেই রয়ে গেল। খুঁটিয়ে দেখলে, চাষযোগ্য জমির এক একটা অংশে প্রতিটা পরিবারের চাষের অধিকার সুনিশ্চিত থাকল এবং এই ব্যবস্থা আজও চলছে। এর একটা সমাজ–জোড়া গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

এসত্ত্বেও কমিউনগুলোর ভাঙন ও গ্রামাঞ্চলে বাজারের শক্তির অনুপ্রবেশ দেঙপন্থী ওই সংস্কারগুলো কার্যকর করার সুযোগ করে দিয়েছিল যাতে 'শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে গ্রামাঞ্চলকে ব্যবহার করা যায়', একই সঙ্গে শহুরে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। বিদেশি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো শহুরে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা চালু করার মধ্য দিয়ে সেই ভিত্তিভূমি গড়ে উঠল, যেখানে শিল্পশ্রমিকদের তথা বিপ্লবের 'নেতৃত্বদায়ী শ্রেণী'–র পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়ে ওঠে।

এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন সংস্থাগুলো (SOE)–কে মুনাফা তৈরির কর্পোরেট সংস্থায় পরিণত করা হল, যেখানে পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সংস্থার ম্যানেজারদের সঙ্গে একসাথে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর মালিক। তারা এই সংস্থাগুলোকে আধা–ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে গেল অথবা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে যা ছিল, তার সবটাই ব্যক্তি মালিকদের কাছে বেচে দিল। এইসব পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় দুই থেকে তিন কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল; পুরনো শিল্পাঞ্চলে, বিশেষত দেশের উত্তর–পূর্ব ও কেন্দ্রীয় অংশে এক 'বেকার শিল্প এলাকা' তৈরি হল।

এইভাবে 'সংস্কারপন্থী'–রা শ্রমিকশ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিল, শ্রমিকেরা আবার সেই 'পুরনো' সর্বহারায় পরিণত হল, যাদের 'হারানোর কিছুই রইল না' — তাদের চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল; তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার যেসব সুযোগ ও অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা দেওয়া হত, সেগুলো কেড়ে নেওয়া হল; ওয়ার্ক ইউনিটে তারা যে বাসস্থান পেত, সেখান থেকে শ্রমিকদের বের করে দেওয়া হল; কোন কোন জায়গায় ওইসব শ্রমিকদের আবাস ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন শপিং মল, বিশাল উঁচু বিলাসবহুল বাড়ি এবং অন্যান্য 'উন্নয়ন' প্রকল্প গড়ে তোলা হল। কিছু কিছু কর্মচ্যুত শ্রমিক বেকারভাতা বা উচ্ছেদের জন্য কিছু টাকা পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার পরিমাণ ছিল খুবই কম এবং অল্প সময়ের জন্য তা দেওয়া হয়েছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিঃস্ব হয়ে পড়ল। অনেকক্ষেত্রেই যে শ্রমিক এই ভাতা পেত, সে ছিল তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি; ফলে এমনকী বহু প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং নাতিরাও অবসরপ্রাপ্ত ঠাকুর্দার পেনশনের টাকাতে টিকে থাকত। যারা নতুন কাজ খুঁজে নিতে পেরেছিল, তারা ব্যক্তি–মালিকানাধীন সংস্থাতেই কাজ করতে বাধ্য হল অথবা ট্যাক্সি চালিয়ে, দিনমজুরের কাজ করে বা রাস্তায় হকারি করে দিন গুজরান করতে লাগল। চাকরি ও সমাজকল্যাণমূলক পরিষেবা হারানোর আঘাত সবচেয়ে বেশি লেগেছে মেয়েদের গায়ে, কারণ প্রথমে মেয়েদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হত এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে তারা ঘরে ফিরে যেত, পুরুষদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকত আর 'পুঁজিবাদী' সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে মানানসই হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল।

'পুরনো' শ্রমিকশ্রেণীর এই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজে বশ মানে ও কম মজুরিতে কাজ করে এমন নতুনতর এক শ্রমশক্তির চাহিদা জোরদার হয়ে উঠল — উপকূলবর্তী রপ্তানি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য, নির্মাণ শিল্পের জোয়ারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আর শহরঞ্চলের গৃহ–পরিষেবার জন্য। এই শ্রমশক্তিকে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক উদ্বৃত্ত শ্রমের ভাণ্ডার থেকে পাওয়া গেল। সেখানে কোটি কোটি কৃষক শুধু চাষের আয় থেকে বেঁচে থাকার রসদ আর কিছুতেই জোগাড় করতে পারছিল না। এর ফলে, আগেকার শহুরে শ্রমিকদের অপসারিত করে তাদের জায়গায় এল গ্রাম থেকে উঠে আসা চাষিদের বিপুল প্রবাহ। যদিও আগেকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার তুলনায় তাদের বেশি বেশি করে কাজে লাগানো হল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রকমারি শিল্পে। দূরাগত শ্রমিকদের প্রথম বড়ো অংশটাই ছিল কৃষক, যারা উপার্জনের অন্য উপায় খুঁজতে বেরিয়েছে, যারা নিজেদের শহরের সাময়িক বাসিন্দা ভাবত, যারা মনে করত কয়েক বছর পরে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে আসার এই প্রবাহ দ্রুত হয়ে দাঁড়াল — যাকে অনেক সময়েই বলা হয় — 'মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অভিপ্রয়াণ'। মাত্র কয়েক বছর আগে এরকম চীনা মানুষের সংখ্যার জাবদা হিসেব ছিল ১৩ কোটি, যা আজকের পরিসংখ্যানে ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

এইসব অভিবাসী শ্রমিকেরা সাধারণত দিনে দশ থেকে বারো ঘন্টা এবং সপ্তাহে সত্তর থেকে আশি ঘন্টা খেটে মাসে ৬০ ডলার থেকে ১০০ ডলার আয় করে। তাদের মজুরিও কম এবং সাধারণত তারা অনেকেই কাজ করেও পয়সা পায় না। তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা পাওনা পড়ে আছে — এটা অভিবাসী শ্রমিকদের অভিযোগ। বিশেষত উপকূলের রপ্তানি শিল্পাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ এইসব অভিবাসী শ্রমিক কারখানার ডর্মিটরিতে এক একটা ঘরে সাত থেকে দশজন গাদাগাদি করে থাকে। অন্য যারা নির্মাণশিল্পের কাজে বা বাড়ির কাজে থাকে, তারা ঘর ভাড়া নিয়ে বা ঝুপড়িতে থাকে। প্রথমদিকে যেসব শ্রমিকেরা এসেছিল, তাদের মধ্যে যারা এখন মাঝবয়সি বা প্রৌঢ়, তারা প্রথম যৌবনে যখন এসেছিল, তখন যতটা কঠিন শ্রম করতে পারত, এখন আর ততটা পারে না; তাদের পক্ষে নতুন কাজও খুঁজে নেওয়া মুশকিল। অনেকেই পেশাগত নানারকম অসুখে ভোগে। নবীন যারা এসেছে, তাদের মধ্যে বিশেষত মেয়েরা, যারা উপকূলের ইলেকট্রনিক্স ও প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করেছে, তাদের অনেকেই অক্ষম হয়ে পড়েছে; কারণ বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে কাজ আর ঘন্টার পর ঘন্টা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে বসে থাকার ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। মালিকদের সাধারণ ঝোঁক হল এইসব শ্রমিকদের অল্প কয়েক বছর কাজ করিয়েই ছাঁটাই করে দেওয়া এবং তাদের জায়গায় নতুনদের কাজে লাগানো।

এই বিরাট অভিবাসনের ফলাফল গ্রামে ও শহরে উভয়স্থানেই টের পাওয়া যায়। এই অভিবাসন–স্রোতের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে এবং তা গ্রামীণ জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে গ্রামাঞ্চলের সংকট একটা পাপচক্রে পড়ে দিন দিন বেড়েই চলেছে। বহু গ্রামে আজ খাটবার মতো এবং বাচ্চা প্রসব করার মতো মানুষ আর নেই, তারা শহরাঞ্চলে চলে গেছে। বহু গ্রামসমাজে এখন প্রায় পুরোটা বৃদ্ধ–বৃদ্ধা আর শিশুরাই রয়ে গেছে। যদিও কারিগরি উন্নতির ফলে কম ভারি পরিশ্রম দিয়েই একটা কৃষিখামার চালিয়ে নেওয়া যায়। তা সত্ত্বেও বয়স্কদের ওপর কাজের বোঝা বেড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিচারেই নয়, এমনকী গ্রামের সামাজিক জীবনও অবনতির পথে চলে যাওয়ায় সেখানে বসবাস করার আর কোন মানে থাকছে না। এর ফলে গ্রাম থেকে আসা যুবক–শ্রমিকদের এক বড়ো অংশ নিজেদের আর 'চাষি শ্রমিক' বলে মনে করছে না, তারা আর কয়েক বছর পরে গ্রামে ফিরে যাবে ভাবছে না। উল্টে তারা বেশি বেশি করে শহরেই থাকতে

চাইছে। এরাই এখন 'নতুন শ্রমিকশ্রেণী', যারা গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চাইছে। অনেকেই গ্রামে তাদের পরিবারকে কোন টাকা পাঠায় না, নিজেদের সঞ্চয় দিয়ে শহরেই একটা নতুন জীবন গড়ে তুলতে চায়। এর ফলে গ্রামীণ সমাজগুলোর অবক্ষয় আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। কারণ গ্রাম থেকে চলে যাওয়া ওই শ্রমিকদের পাঠানো টাকার ওপর সেই গ্রামসমাজ অনেকটাই নির্ভর করে এবং তা কমে গেলে তারা ভীত হয়ে পড়ে। খাদ্য উৎপাদন বজায় রাখা, যা চীনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, তাও এই নতুন প্রজন্মের শ্রমিকদের হাতে মার খাচ্ছে। এদের আর চাষের কাজ করার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই নেই। এই অভিবাসী শ্রমিকেরা প্রতিদিন এদের জমি আরও বেশি বেশি করে লিজ দিয়ে দিচ্ছে অথবা পুরোপুরি ফেলে রেখে চলে আসছে।

এসবের ফলশ্রুতিতে শ্রমিকশ্রেণীর ত্রিস্তর বিভাজন ঘটেছে, যদিও ওই তিনটি স্তরই অবস্থার বিচারে কাছাকাছি জায়গায় আছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা (SOE) বেশিরভাগই উঠে গেছে; কোন কোন অঞ্চলে ওই সংস্থাগুলোর ৭০–৮০% শ্রমিক লে–অফ হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলোর আগেকার শ্রমিক–কর্মচারীদের অনেকটাই জনসমক্ষ থেকে 'অদৃশ্য' হয়েছে। এরা অনেকেই আজ দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যারা এখনও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কাজ করছে, তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার সস্তা এবং ক্ষমতাহীন শ্রমিকদের মতো খাটানো হয়। ওই ফার্মগুলোতে প্রচুর অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। যদিও গত কয়েক বছর যাবৎ সরকার এদের কিছু মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা দানের চেষ্টা করছে। এরাই 'বিশ্ব কারখানা' হিসেবে চীনের ভিত্তি তৈরি করছে। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের ক্ষমতার কাছে এদের কাজ ও জীবনের অবস্থা নড়বড়ে, যার ওপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। এদের অনেকেরই এখনও খামার আছে, কিন্তু উত্তরোত্তর এরা গ্রামীণ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এখনও যারা জমিতে টিকে রয়েছে, তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এরকম কয়েক কোটি মানুষ যথেষ্ট উপার্জনের কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না। এই অবস্থা তাদের গ্রাম থেকে শহরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে নৃশংস এক শোষণের মুখে। একভাবে এই অভিবাসী শ্রমিকেরা কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে এক ধরনের 'সেতু' গড়ে তুলছে। যদিও পুরনো শ্রেণী মনোবৃত্তির দ্বারা বিভক্ত যে কোন স্তরের অধিকাংশ শহরবাসীই গ্রাম থেকে আসা মানুষকে ছোটো চোখে দেখে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকের অবস্থা প্রায় এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, দক্ষিণের উপকূলবর্তী রপ্তানি শিল্পের তুলনায় সাংহাই অঞ্চলে 'পুরনো' শ্রমিক ও 'নতুন' অভিবাসী শ্রমিকেরা একসঙ্গেই মিলেমিশে থাকে। এই দু'ধরনের শ্রমিকদের অবস্থা যত বেশি এক হয়ে যাচ্ছে, ততই চালু ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের ভিত আরও মজবুত হচ্ছে।

একই সময়ে চীনা সমাজের সামগ্রিক বিভাজন আরও বিস্তৃত হচ্ছে। এটা আসলে এর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির ফল। যে উন্নয়ন হচ্ছে, তা ভীষণ অসম প্রকৃতির। যারা সবচেয়ে বড়ো শহরগুলোতে বা তার কাছাকাছি থাকে, তারাই এই উন্নয়নের সরটুকু খায়। আর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অবস্থা থমকে আছে বা খারাপ হচ্ছে। দুই দশকের মধ্যে চীন দুনিয়ার সবচেয়ে সমতাবাদী দেশ থেকে সবচেয়ে বিভাজিত দেশে পরিণত হয়েছে। একদম ওপরে রয়েছে বড়ো বুর্জোয়া আর মুৎসুদ্দিরা, এদের সঙ্গে আছে পার্টি ও রাষ্ট্রের পদাধিকারী। এরা দুর্নীতি, ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ আর বিদেশি সংস্থাগুলোর সঙ্গে লেনদেন মারফত পয়সা করেছে। এদের মিত্র হল পেশাজীবী ও ম্যানেজারদের এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী আর গ্রামের বড়োলোকেদের একটা স্তর — যার মধ্যে আছে সবচেয়ে বড়ো চাষি আর স্থানীয় শোষক কর্তৃপক্ষ। এইসব পুঁজিবাদী শক্তিগুলো অনবরত ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে একটা মেরুকরণ ও রাজনৈতিক বিভাজন আরও বিস্তৃত করছে। বিপ্লবের আগে চীনকে যারা শাসন করত, সেরকম এক সংঘবদ্ধ শাসকের চেহারার সঙ্গে এদের মিল ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, এখনকার এক বিপ্লবী সমাজকর্মীর ভাষায়, 'কমুনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট'–দের এক ঐক্য শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করছে।

লক্ষ কোটি টাকার মালিকের সংখ্যা বাড়ছে — একটা হিসেব অনুযায়ী চীনে এমন বড়োলোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আর উল্টোদিকে দারিদ্রের অন্ধকারে নিমজ্জিত শ্রমিক আর কৃষকেরা। অসাম্য মাপার জন্য যে 'গিনি' সূচক আছে, তাতে মাপলে চীনের এখন ৪৭ পয়েন্টের কাছাকাছি, 'বিপদ পয়েন্ট' ৪০–এর অনেক ওপরে এবং ভারতের ৩৭ পয়েন্ট থেকেও বেশি। সমস্ত সামাজিক মাত্রাতেও এই বিভাজন বেড়েই চলেছে — গ্রাম ও শহর উভয়ের ভিতরে, গ্রামের সঙ্গে শহরের, উপকূলের সঙ্গে অন্তর্বর্তী এলাকার, উচ্চ প্রযুক্তির সঙ্গে কম 'আধুনিক' ক্ষেত্রের ফারাক বাড়ছে। কিছু শ্রমিক ও কৃষকের সামান্য উন্নতি হলেও বেশিরভাগেরই তুলনামূলক বিচারে অবনতি হচ্ছে। এখন প্রচুর ভোগ্যপণ্য থাকলেও অনেকেই বেশি দামের জন্য তা কিনতে পারে না। এমনকী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংস্কারের কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে, তারাও এখন বেশ ভঙ্গুর ও বিভাজিত হয়ে পড়েছে। যদিও কলেজ পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রাজুয়েটদের জন্য কাজের জায়গা আরও বেশি সংকুচিত হয়েছে। এইভাবে ভারতের মতো একটা 'শিক্ষিতদের সংরক্ষিত বাহিনী' সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম ও শহর সর্বত্র দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত। বহু পার্টি ও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা প্রোমোটারদের সঙ্গে সাঁট করে গ্রামের লোকেদের জমি বেচে দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তা করা হচ্ছে; শহরগুলোতে নানারকম অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে আংশিক বা পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থায় পরিণত করা হচ্ছে আর ব্যাপকভাবে শ্রম অধিকার ও পরিবেশ–বিধি অমান্য করা হচ্ছে এবং তার জন্য কার্যত কারও কোন শাস্তি হচ্ছে না। মাওয়ের যুগে যে সমস্ত জিনিস একেবারে মুছে গিয়েছিল, সেই বেশ্যাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, রঙিন খাদ্য, ভেজাল ওষুধ, নিরাময়যোগ্য অসুখ, সবই আবার ফিরে এসেছে। এ ধরনের অবক্ষয়ের ফলে গ্রামাঞ্চলে যে গণ–অসন্তোষ বেড়ে উঠছে, তার বিপদ সম্পর্কে জাতীয় নেতারা সম্যকভাবেই ওয়াকিবহাল।

দেশের প্রেসিডেন্ট এবং পার্টি সেক্রেটারি হু জিনতাও এবং প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও কতকগুলো সীমিত পদক্ষেপ নিয়ে এই সমস্ত চাপ কিছুটা কমাতে চাইছেন। যে গ্রামাঞ্চলকে তাঁরা 'নতুন সমাজতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চল' বলেন, সেখানে তাঁরা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বৃহদাকার বিনিয়োগের কর্মসূচি নিয়েছেন; সবচেয়ে গুরুভার বহু কর ও বেতন (fees) কমানো হচ্ছে; কৃষি উৎপন্নের সহায়ক মূল্য বাড়ানো হচ্ছে; শিক্ষার অগ্রগতি ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। এইসব উন্নয়নের কর্মসূচি কৃষক সমাজকে কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছে। কিছু শ্রমিক শহর থেকে গ্রামের জমিতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এর কোন দীর্ঘমেয়াদি ফল পাওয়া মুশকিল। কারণ অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলো একইরকম থেকে যাচ্ছে। বিশেষত, 'সংস্কার' যুগের গোড়ায় যে 'পারিবারিক দায়িত্বের ব্যবস্থা' চালু হয়েছিল, তা মূলত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) যে নীতিগুলো চাপিয়ে দিয়েছে তার জেরে আর চলতে পারছে না। কোটি কোটি চীনা কৃষকের কাছে প্রতিযোগিতার লড়াই কেবল হেরে যাওয়ার জন্য; এমনকী জমির ওপর তাদের অধিকার ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। যে অর্থনৈতিক চাপ তাদের গ্রামের জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য

করছে, এটা কেবল তারই ফল নয়। 'জমি অধিগ্রহণ' ও কৃষিজমিকে উন্নয়নের প্রকল্পে ঢুকিয়ে দেওয়ার আশঙ্কাও এর একমাত্র কারণ নয়। আজ কৃষিজমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন করে দিয়ে এবং সমষ্টিগত মালিকানাকে একদম শেষ করে দিয়ে গ্রামে 'সংস্কার'–এর কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার আওয়াজ উত্তরোত্তর জোরালো হয়ে উঠছে। এইভাবে জমিগুলোকে ব্যক্তিমালিকানায় রূপান্তরিত করা গ্রামীণ জনসাধারণের শেষ নিরাপত্তার বেড়াটা ভেঙে ফেলবে এবং আরও দ্রুত লক্ষ কোটি মানুষকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে গিয়ে জড়ো করবে। এমন ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে এই কর্মসূচি কৃষক বিদ্রোহের জন্ম দেবে। এরকম বিপদ সংকেতই এই মুহূর্তে ব্যক্তির হাতে জমির হস্তান্তর আটকে রেখেছে। কিন্তু এদিকে যাওয়ার চাপ আসছে খোদ 'পুঁজিবাদী পথ'–এর যুক্তি থেকে, যা প্রতিটি জিনিসকেই 'মুক্ত বাজার'–এ বিক্রির বস্তু করে তুলতে হবে বলে দাবি করছে। কাজেই এরকম হবে বলে মনে হয় না যে বর্তমান জমির মালিকানা ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কাল থেকে যাবে আর শ্রেণী বিভাজন বেড়েই চলবে।

বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবে এই বিভাজনগুলো কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। সংকটের ধাক্কা চীনকে প্রথমদিকে তেমন আঘাত করেনি। কারণ চীনের ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলোতে দৃঢ় সরকারি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক যুগের কিছু অবশেষ থেকে গেছে। কিন্তু মন্দা অপরিহার্যভাবে চীনা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করল। বিশেষত পশ্চিমে — যেখানে ক্রেতার ব্যয় দারুণভাবে পড়ে গেল — রপ্তানির ওপর চীনের অতি নির্ভরতার কারণে এটা ঘটল। চীনের ভিতর এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের দ্রুত অবনমন দেখা দিল; বাইরে থেকে আসা পুঁজির গতি হ্রাস পেল এবং নির্মাণশিল্প দারুণ মার খেল। দুই থেকে তিন কোটি গ্রাম থেকে আসা শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল এবং তাদের বেশিরভাগ গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেল। যদিও অনেকে গ্রামে স্বল্পমেয়াদি কাজ জোগাড় করে ফেলল কিংবা তাদের কর্মপ্রতিষ্ঠানের মন্দা কাটার অপেক্ষায় রইল। শহর থেকে তাদের যে পয়সা আসত তা একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই মন্দাগ্রস্ত গ্রামাঞ্চলে এক প্রচণ্ড আঘাত নেমে আসল। তখনও কাজে যুক্ত অভিবাসী শ্রমিক সহ শহরের শ্রমিকরা একইভাবে আক্রান্ত হল। সম্প্রতি নিম্নতম মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও হারাতে হল। এমনকী মধ্যবিত্তরাও বাড়ির দাম ও স্টক মার্কেট পড়ে যাওয়ার ফলে সংকটের ধাক্কা খেয়েছিল; এদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ায় সরাসরি ধাক্কাও খেয়েছে।

এসব সামলাতে সরকার প্রায় ছ'শ লক্ষ কোটি ডলারের একটা উদ্দীপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর লক্ষ্য ছিল বিশেষত গ্রামাঞ্চল ও অভিবাসী জনসমষ্টির জন্য পরিকাঠামো প্রকল্প ও সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটা অবশ্যই ছাঁটাই শ্রমিকদের অস্থায়ী চাকরি পেতে সাহায্য করল; গ্রামাঞ্চলকে একটা পরিমাণ পুনরুজ্জীবিত করল এবং সামগ্রিকভাবে চীনা সমাজেও খানিকটা প্রাণ সঞ্চার হল। সেই খানিক এতটাই যে অন্য অনেক দেশ বিশ্বকে সংকটমুক্ত করতে একে একটা দাওয়াই হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে যে দুর্বলতা আছে, তা দ্রুতই সমস্যাকে সামনে নিয়ে এল। এর মধ্যে প্রাথমিক হল, ক্রেতার একটা শক্ত ভিত্তির অভাব, যে ভিত্তি চীনের রপ্তানি নির্ভরতার জায়গা নিতে পারত। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের মানুষের সীমিত আয়ের ফলে এই ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। যদিও সরকার গ্রামাঞ্চলে আরও পণ্য–ভোগকে উৎসাহিত করার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, একটা স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনা চালু করার চেষ্টা তারা করেছিল, যাতে কৃষি–পরিবারগুলো জরুরি চিকিৎসার জন্য সঞ্চয়ের ঝোঁক কমিয়ে বাজারের জিনিসপত্র কেনার পিছনে খরচ করতে পারে। জাতীয় নেতারা স্বীকার করে, এমন ব্যবস্থা যদি বা চালু করা যায়, তা অনেকদিনের চেষ্টাতেই করা সম্ভব। অতএব যে রপ্তানি শিল্পের ওপর অর্থনীতির বৃদ্ধি নির্ভর করেছিল, সরকার সেই রপ্তানি শিল্পকে উজ্জীবিত করতেই দ্রুত নজর ঘোরালো।

ফলে যদিও তারা আশু সংকট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চটজলদি রাস্তা দক্ষতার সঙ্গেই বার করে ফেলেছিল, তবু তারা ব্যবস্থার অন্তর্লীন মৌলিক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করার মতো কোন নীতি গড়ে তুলতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্তারা 'সামাজিক আলোড়ন'–এর শক্তিশালী উত্থানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমনকী সংকটের আগেও, তারা যাকে 'বড়ো গোলমাল' বলে থাকে, সেরকম ঘটনার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক লক্ষেরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এর অনেকগুলো আজকের দুনিয়ায় দেখতে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদগুলোর অন্যতম। কিন্তু শুধুমাত্র কতকগুলো বিশেষ নাটকীয় ঘটনা বাদে চীনের বাইরে তার কোন সাড়া পড়েনি। যদিও এর মধ্যে বেশিরভাগ বিক্ষোভ প্রদর্শনই ছিল তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ — যেমন, সরকারি বা অন্যান্য সংস্থাকে ঘিরে রাখা, বড়ো রাস্তা বা রেলপথ অবরোধ করা অথবা সেরকম অন্য কিছু — হিংস্রতার ঘটনাও মনে হয় বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে পুলিশ এমনকী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। প্রতিবাদের ধরনও সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে। ১৯৯০–এর দশকে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা (SOE)–র লে–অফ শ্রমিকেরা। তারা তাদের চাকরি, পেনসন ও বাসস্থান বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে, এই প্রাক্তন রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে এবং লোকে তাদের ভুলে গেছে; তাদের বিক্ষোভগুলো যেন পিছনের সারির প্রতিরোধের মতো হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এখনও তারা অনেকেই একই জায়গায় থাকে; এমনকী ট্যাক্সি চালানোর মতো একই ধরনের কাজের মধ্যে থাকে, যা তাদের একসঙ্গে কিছু করার একটা ভিত্তি জুগিয়ে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০৯ সালের শেষের দিকে অতিরিক্ত কর, পুলিশি ঝামেলা ও অন্যান্য অভিযোগে ট্যাক্সিচালকদের প্রতিবাদ কয়েকটি শহর থেকে শুরু হয়ে চীনের বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় সংস্থায় যারা এখনও কাজ করে, তাদের মধ্যে কর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার রেওয়াজ বেড়ে চলেছে। কারণ তাদের অবস্থা খারাপ হতে হতে ভীষণভাবে শোষিত সর্বহারার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের চাকরি এবং অন্য সুযোগসুবিধার নিরাপত্তা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এদের অনেকের অবস্থা কৃষকদের চেয়েও খারাপ, কারণ কৃষকদের আর যাই হোক চাষ করার জন্য এক টুকরো জমি আছে। ফলত 'পুরনো' শহুরে শ্রমিকশ্রেণী আরও আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং প্রতিবাদে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আরও সাম্প্রতিক সংযোজন হল, যে অভিবাসী শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ সমস্ত অধিকার হারিয়ে বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় শ্রমশক্তি হয়ে বসে রয়েছে, তারা আইনি পথে লড়াই শুরু করেছে; হঠাৎ হঠাৎ ধর্মঘট বা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, যার মধ্যে কিছু কিছু হিংস্র আকার ধারণ করছে। এই প্রতিবাদগুলোর বেশিরভাগই কম বা বকেয়া মজুরির দাবিতে; কাজের ও বসবাসের পরিবেশ খারাপ হওয়ার বিরুদ্ধে এবং কর্মস্থলে দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে কাজের জায়গায় অসহনীয় চাপের মুখে পড়ে অনেক অভিবাসী নবীন শ্রমিক কেমন হতাশ হয়ে পড়েছে, তা স্পষ্টতই একটা ঘটনায় প্রকাশ হয়ে যায় — ২০১০ সালের গোড়ায় মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এদের জনাদশেক আত্মহত্যা করে। এরা সবাই তাইওয়ান মালিকানাধীন বিশাল ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ফক্সকন–এর গুয়াঙদঙ প্রদেশের শেনঝেন ও অন্যান্য প্ল্যান্টে কাজ করত। ওখান থেকে

মাত্র কয়েক মাইল দূরে হন্ডা ট্রান্সমিশন প্ল্যান্টে শ্রমিকেরা এমন ধর্মঘট করেছিল যে তাদের চারটি অ্যাসেম্বলি কারখানা একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তাদের দাবি ছিল মজুরি অনেকটা বাড়াতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দিতে হবে। বিদ্বজ্জন ও সমাজকর্মীরা দেশের বাইরে ও ভিতর থেকে এদের এমন সহায়তা করেছিল যে এই শ্রমিকদের কয়েকটা বড়ো জয় হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে এরকম সব কর্মসূচির ফলে বেশ কিছু জায়গায় মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনা চীনা অর্থনীতিতে নতুন দ্বন্দ্ব পাকিয়ে তুলেছে। যেহেতু বিদেশি সংস্থাগুলো দেশের মধ্যে অথবা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় আরও সস্তার শ্রম শোষণের চেষ্টা করে যাচ্ছে, ফলে উপকূলে রপ্তানির মাধ্যমে কয়েক দশকের যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তা এই ধরনের আন্দোলনের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

অংশত উপকূলের 'এক্সপোর্ট জোন' বা রপ্তানি শিল্পগুলোতে এবং শ্রমিকদের তলার অংশ থেকে দাবিদাওয়াগুলো বারবার উঠে আসায়, 'অল চায়না ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস' (ACFTU)–এর নেতারা এই প্রথম গুরুত্ব সহকারে বিদেশি মালিকানাধীন কারখানাগুলোতে সংগঠন গড়ে তুলছে। তারা কারখানার ভিতরে অন্তত শ্রমিকদের কাজের সহায়তার জন্য ন্যূনতম পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু এখনও এই সংগঠনকে মূলত সরকার ও কারখানার কর্তাব্যক্তিদের হাতিয়ার বলেই অধিকাংশ শ্রমিক মনে করে। 'হন্ডা' ধর্মঘটকারীরা এই ACFTU–কে বাদ দিয়েই কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। লড়াই করার কোন ফল্প্রসূ উপায় বার করতে না পেরে, গ্রাম থেকে আসা অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছে, তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'পা দিয়ে ভোট দিচ্ছে', এই কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া এত পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে উপকূলের কারখানাগুলোয় শ্রমিকের বেশ অভাব দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ফিরে যাওয়ায় অবস্থা যে কিছু ভালো হচ্ছে তা নয়। সেখানে গ্রাম্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধোঁকা দিয়ে জমি দখল করা, শোষণমূলক অর্থনৈতিক নীতি এবং পরিবেশের পক্ষে হানিকর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিবাদে কৃষকেরা অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবাদের প্রধান কারণ হল দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং রাষ্ট্র ও পার্টির কর্তাব্যক্তিদের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি। দেশ জুড়ে খেটে খাওয়া মানুষের যে সমস্ত বিক্ষোভ দেখা গেছে, তার অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু গ্রামের এই অসংখ্য আন্দোলন সাধারণের নজরে কমই এসেছে। দূষণকারী সংস্থা ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নকারীদের অনিবার আক্রমণে এবং রিয়েল এস্টেট ও স্টক মার্কেটের দ্রুত ফুলে উঠে ফেটে যাওয়ার চক্করে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' আর নিজেদের অবস্থাকে স্থিতিশীল না করতে পারায়, তারাও শহরের রাস্তায় নামছে। বিশেষত তাদের আশঙ্কা হল, জীবনযাত্রার মান নিজেদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও অটুট রাখা যাবে না। কলেজের ডিগ্রিগুলো কাজের বাজারে অচল হয়ে পড়ায় ছাত্ররা ডিগ্রিগুলোর বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। গ্রাজুয়েটদের জন্য কাজের অভাব এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিবাদই প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত। সেগুলো স্বল্পমেয়াদি, সহজেই কিনে নেওয়া যাচ্ছে বা দমন করা যাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বৃহৎ ঐক্য গড়ে না ওঠার কারণ হল, প্রধানত কোন স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে রাষ্ট্রের প্রবল বাধা এবং শ্রমিক, কৃষক ও গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব। এমনকী একই শহর, একই শিল্প বা একই গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবীদের মধ্যে সামান্যই সংহতি রয়েছে, তারা বেশিরভাগ বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে মাঝে মাঝে সংযোগ গড়ে উঠছে। অনেক কারখানায় একসঙ্গে বিক্ষোভ এবং শ্রমিক–কৃষকের যৌথ বিক্ষোভেরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই ধরনের ঐক্য শ্রেণী–গণ্ডী ছাড়িয়েও গড়ে উঠছে। যেমন ২০০৯ সালের শেষদিকে গুয়াঙঝৌতে একটা দূষণকারী চুল্লি বানানোর বিরুদ্ধে এক হাজার মধ্যবিত্ত বাসিন্দা প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু প্রথমে ওই অঞ্চলের কৃষকরা এই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও সাংবাদিকদের মিছিলে শামিল করতে এখানে আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন [ইন্টারনেটে] 'টুইটার'–ও ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনা দেখিয়ে দেয়, শ্রেণীগুলোর নিজেদের ভিতরে এবং একের সঙ্গে অপর শ্রেণীর বড়ো ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা পার্টি ও রাষ্ট্রের কর্তাদের খুবই মাথা ব্যথার কারণ। তারা ভয় পাচ্ছে, প্রতিবাদগুলো এখনও মূলত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত থাকলেও এগুলো জোট বেঁধে একটা দেশ জোড়া আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। চীনা সমাজের দ্বন্দ্বগুলো দ্রুত গভীর হয়ে উঠছে, উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম 'সংস্কার'–এর মূল ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করার দিকে তা এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই 'পুঁজিবাদী পথ'–এর সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সর্বোপরি, এইসব প্রশ্নের বর্শামুখ অর্থনীতির অনিয়ন্ত্রিত প্রসারের দিকে।

তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে চলা 'সংস্কার' সম্পর্কে এই ব্যাপক মোহমুক্তি মাওয়ের সময়কার সমাজতান্ত্রিক যুগ সম্পর্কে আগ্রহকে ফিরিয়ে এনেছে। তিন দশক ধরে চীনে যে ধারাবাহিক ও বিস্ফোরক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছে; দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে এখানে আর চীন হয়ে উঠেছে এক বড়ো বিশ্ব–শক্তি, অংশত এই মোহমুক্তি গোটা বিষয়টার পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন হাজির করে দিয়েছে। দেশের ভিতরে ও বাইরে অনেকেই এটাকে সোজাসুজি একদলীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী নীতির ফলাফল বলে মনে করে। কিন্তু চীনের 'যাত্রা'–কে শক্তি জুগিয়েছিল এর বিপ্লবী ভিত্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'অগ্রগতির সূচনা' হতে পেরেছিল আগের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমেই। সমাজতন্ত্রের যুগে জমির পুনর্বন্টন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য–সুরক্ষা ও শিক্ষা, শ্রমিক ও কৃষকের অধিকার যা যা সম্পন্ন হয়েছিল, তার ওপর দাঁড়িয়েই চীন পরবর্তী 'সংস্কার'–এর সময়ে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার সকলকে ছাড়িয়ে 'লাফ মেরে এগিয়ে' গেছে। তাছাড়া, যদিও প্রত্যেক শ্রেণী ও স্তরের কিছু মানুষ নতুন বাজার অর্থনীতিতে 'ধনী হওয়ার' রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, বেশিরভাগের জন্য প্রথমদিককার উন্নতিগুলো টেকেনি। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই পুঁজিবাদী 'সংস্কার' ও 'বিশ্বের কাছে দরজা খুলে দেওয়া' ক্রমশ দুর্যোগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা সমষ্টিগত নিরাপত্তা হারিয়েছে; দ্রুত ও একনাগাড়ে বেকারি, অভিবাসন, শোষণ, মেরুকরণ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য অনেকেই পিছনে ফিরে সমাজতান্ত্রিক যুগের দিকে তাকাচ্ছে; তখনকার সামাজিক সুবিধাগুলো এবং সমতার দাবিকে আবার তুলতে চেষ্টা করছে; এবং তখন থেকে কী কী ভুল হয়ে গেছে তা বোঝার চেষ্টা করছে। অল্পসংখ্যক মানুষ সোজাসুজি মাওয়ের যুগে ফিরে যেতে চাইছে। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী বছরগুলোতে যে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার পরে এটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু অনেকেই খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে, একটা পরিচ্ছন্ন সরকার, সমতার মনোভাব এবং সেই সময়কার পরিচিত 'জনগণের সেবা করো' নৈতিকতাগুলো ফিরিয়ে আনা দরকার।

এর ফল হিসেবে 'সংস্কার'–এর মতাদর্শ আরও বেশি বেশি করে বদনাম কুড়োচ্ছে। এমনকী হু এবং ওয়েন নিজেদের অনেকটা 'মাওবাদী' আবরণে সাজাতে চেষ্টা করেছেন; সেই সময়কার কিছু অভ্যাসকে অন্তত আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে মার্ক্স চর্চার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু খুব কম লোকেরই এমন ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ওঁরা

সত্যিই সমাজতন্ত্রের দিকে ঘুরে দাঁড়াবেন। বরং বামপন্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক 'পুরনো' বামপন্থী, যারা মাওয়ের সময়ে কাজ করেছে, শেষপর্যন্ত তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম তাদের ভয় ও বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছে। এদের বেশিরভাগই বয়স্ক এবং তারা অনেকদিন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তবুও সবরকম বয়সীদের মধ্যে এই 'পুরনো' বামদের অনুগামী রয়েছে। এদের পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্র উভয় জায়গাতেই পাওয়া যায়, কোন সরকারি পদে নেই এমনদের মধ্যেও এরা আছে। মূলত তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও একটা 'নতুন' বাম অংশ গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য পুনর্মূল্যায়ণ ও মাওয়ের থেকে কিছু কিছু বিষয় গ্রহণের পক্ষে। কিন্তু তার সঙ্গে এরা পশ্চিমি ধারণা ও বিভিন্ন কেতাবি সূত্র থেকে পাওয়া উদার ও ভালো ধারণাগুলো গ্রহণ করে এক বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় মতাদর্শের দিকে যেতে চায়। এদের মধ্যে অনেকে, বিশেষত কলেজের ছাত্ররা, কারখানা ও কৃষি খামারগুলোতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে; তাদের অবস্থা বোঝা ও তাদের আইনগত ও জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুবই ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এরা সংগঠিত হচ্ছে না। সর্বোপরি, চীনা বামপন্থীদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, যা কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তা হল, শ্রমিক–কৃষক–অভিবাসী এবং এদের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব।

এসব সত্ত্বেও আজকের চীনে এক ধরনের প্রাক বিপ্লবী আলোড়ন আছে, যেমন ছিল রাশিয়ায়, যখন লেনিন প্রথম কয়েক দশক ধরে সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন; তিনি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজ এমনকী রাষ্ট্র ও পার্টির 'সরকারি' মার্ক্সবাদ, যা 'সংস্কার'–এর একটা আড়াল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বেড়েই চলেছে; মাওয়ের যুগের বিষয়গুলো ফিরে আসছে। কিন্তু এখনও খুব অল্পসংখ্যক বামপন্থীই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগঠন গড়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে। যারা এই চেষ্টা করে, তাদের ওপর প্রচণ্ড নজরদারী ও দমন চালানো হয়। সামগ্রিকভাবে বামেরা দুর্বল, বিভক্ত এবং তৃণমূল স্তরের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের একটা উচ্চতর পর্যায়ের আভ্যন্তরীণ সংগঠন, একটা বিপ্লবী কর্মসূচি এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ দরকার। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো থেকে অবশ্য মনে হয়, এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করার মতো প্রাথমিক সম্ভাব্য পদক্ষেপ উঠে আসতেও পারে। ২০০৯ সালের শেষের দিকে সিচুয়ান প্রদেশের চংকিঙ–এ নতুন একটা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) গঠন করার জন্য একটা সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যে প্রাদেশিক পার্টির নেতাকে এই উদ্দেশ্যের সমর্থক হিসেবে সভার সংগঠকেরা সরল মনে অতিরিক্ত বিশ্বাস করেছিল, তিনি জমায়েতটা ভেঙে দেন। অতএব প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। যারা এটা করার চেষ্টা করেছিল, তাদের হাজতে পাঠানো হল। কিন্তু এই সভাকে একটা ইঙ্গিত হিসেবে ধরা যেতেই পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে আরও সতর্ক পরিকল্পনার মধ্যে বামপন্থীরা জোট বাঁধবে।

হু ও ওয়েন যে 'সমন্বয়ী সমাজ'–এর বিন্যাস ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন, তার বিপদ বাঁধের পিছনের জলের মতো বেড়ে উঠছে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো চীনেও সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বগুলো গভীর হচ্ছে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী নীতির অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাগুলো দ্রুত আকার নিচ্ছে। 'বিশ্বায়ন'–এর প্রভাবে, বিশেষত পৃথিবী জোড়া সংকট যদি ঘনীভূত হয়, এক সার্বিক ঘুরে দাঁড়ানো অথবা এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও রয়েছে। অতএব যারা অনুসরণযোগ্য এক সম্ভাব্য আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে চীনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাদের একটা গোটা প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা দরকার; যে প্রক্রিয়ায় সেই চীন শেষ হয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর সাম্প্রতিক দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ভিত্তি ছিল, এর আগের বৈপ্লবিক রূপান্তর। অন্যদের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি সহজে হয় না এবং আজকে 'সংস্কার'–এর বিরোধগুলো বেড়ে ওঠার ফলে সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকাও সন্দেহজনক। দক্ষিণ গোলার্ধের অন্যান্য অংশের মতো ভারতেও চীনের আজকের 'পুঁজিবাদী পথ' নয়, বরং তার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বের দিকেই অনেকে তাদের সংগ্রামের পথ প্রদর্শক হিসেবে তাকিয়ে থাকছে। শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়লে হয়তো বা চীনারা আর একবার তাতে যোগ দেবে এবং আবার একবার সমাজতন্ত্রের পথের যাত্রায় বিশ্বজোড়া বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে সহায়তা করবে।

চীনের গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব

জিতেন নন্দী

১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল শহর থেকে, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্তর থেকে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ওপরতলার নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সচেতন 'পুঁজিবাদী পথিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাই আওয়াজ উঠেছিল 'সদর দপ্তরে কামান দাগো'।

এর মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯৬২–তে যখন 'সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন'–এর অঙ্গ হিসেবে 'চার সাফাই' অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হল, তখন টার্গেট ছিল গ্রাম্য চাষি ও নিচুতলার ক্যাডারদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আদর্শনৈতিক ও সাংগঠনিক ময়লা সাফ করা। এই ময়লা বলতে তখন বোঝানো হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী ঝোঁকের কথা। গ্রামের পাঁচ ধরনের লোক — পুরনো জমিদার, পুরনো ধনী চাষি, প্রতিবিপ্লবী, খারাপ লোক এবং অসংশোধিত দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এই ঝোঁক স্বাভাবিকভাবেই ছিল। ১৯৬৩ সালে লক্ষ লক্ষ শহুরে ছাত্র–যুবককে পার্টির পক্ষ থেকে 'ওয়ার্ক টিম' নাম দিয়ে গ্রামে পাঠানো হল। গ্রামে প্রোডাকশন ব্রিগেড ও প্রোডাকশন টিম স্তরে চাষিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের উৎপাদনের কাজে যুক্ত করা হল। কারণ ব্রিগেড এবং তার নিচের উৎপাদন টিমের ক্যাডাররা অনেকেই গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষি পরিবার থেকে আসা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী ঝোঁক থেকে মুক্ত ছিল না।

১৯৬২ সালেই পার্টি (রেগুলেশন অন দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য রুরাল পিপল্‌স কমিউন) পরিবার অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্তরে আনুষঙ্গিক উৎপাদন চালানোর অনুমোদন দিয়েছিল। প্রত্যেক উৎপাদন টিম কমিউন–ব্যবস্থার সমবেত চাষের পাশাপাশি তাদের চাষযোগ্য জমির ৫–৭% প্রত্যেক পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আলাদা সংরক্ষিত রেখেছিল। এছাড়া চাষিরা শুয়োর, মুরগি, হাঁস পালন করতে পারত; সীমিত সংখ্যক ফলের গাছ ঘরের পাশে অথবা পাহাড়ের পতিত জমিতে লাগাতে পারত এবং টিমের কাজ সেরে মাছ বা হস্তশিল্পের মতো কাজ ব্যক্তিগত স্তরেই চালিয়ে যেতে পারত। যদি কোন পরিবার টিমের ওয়ার্কপয়েন্ট অনুযায়ী পাওয়া খাদ্যশস্য দিয়ে সংসারে ভাতের যোগানটা দিতে পারত, পার্শ্ব–উৎপাদন

থেকে কিছুটা অর্থের আমদানি হত। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, একজন চাষি বা তার পরিবারের যতটা উদ্যম, তার বেশিরভাগটা যদি এই পার্শ্ব-উৎপাদনে ব্যয় হয়ে যেতে থাকে, তাহলে টিমের সমষ্টিগত চাষে কতটুকু উদ্যম অবশিষ্ট থাকতে পারে? এই প্রক্রিয়ায় গ্রামের চাষিসমাজের মধ্যে থাকা ওই পাঁচ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত 'পুঁজিবাদী পথিক'-রাই শুধু নয়, গরিব ও নিম্ন-মধ্য চাষিরা তাৎক্ষণিক ব্যক্তি-স্বার্থের দিকে ঝুঁকতে থাকল, যা দীর্ঘমেয়াদি সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই 'স্বতঃস্ফূর্ত' শব্দটা বেমালুম সরে গেল; ১৯৬৬-র সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এল 'সচেতন' পুঁজিবাদী পথিকের বিপদের অ্যাজেন্ডা। ১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকেই মাও সেতুঙ বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে বেশি বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির সর্বোচ্চ স্তর পলিটব্যুরোতে তিনি চীনের সংস্কৃতিতে একটি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এই পরিকল্পিত বিপ্লবকে দেখভাল করার জন্য পেঙ ঝেন-এর নেতৃত্বে একটি পাঁচজনের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাস্তবায়িত হতে থাকল, একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকল, তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে মাও সেতুঙ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের পুরনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে একের পর এক নতুন পদক্ষেপ ঘোষণা করতে হল। পার্টির ওপরতলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব হিসেবে 'পাঁচজনের গোষ্ঠী' ভেঙে দিয়ে 'কালচারাল রেভলিউশন গ্রুপ' তৈরি করা হল। পার্টির সদর দপ্তর মাও-সঙ্গীদের আখ্যা অনুযায়ী আড়াআড়ি 'বুর্জোয়া সদর দপ্তর' এবং 'সমাজতান্ত্রিক সদর দপ্তর'-এ ভাগ হয়ে গেল।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে 'বড়ো হরফের পোস্টার' লিখনের মধ্য দিয়ে শহরাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। এই পোস্টারগুলির তলায় স্বাক্ষর করা হয়েছিল 'রেডগার্ড'। এর আগে সাংহাইয়ের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সংবাদপত্রে তোলপাড় হয়ে যায়। ইয়াও ওয়েনইউয়ান এই প্রবন্ধে একটি ঐতিহাসিক নাটকের (১৯৫৯ সালে পিকিংয়ের ডেপুটি মেয়র ঐতিহাসিক উ হান-এর লেখা নাটক 'হাই রুই ডিসমিস্‌ড ফ্রম অফিস') সমালোচনা করেন। নাটকটি প্রথমে মাও সেতুঙের প্রশংসা পেয়েছিল। পরে এই নাটকের বক্তব্যে খোদ মাওয়ের সমালোচনা খুঁজে পান মাওয়ের স্ত্রী জিয়াং কিঙ এবং ইয়াও ওয়েনউইয়ান। পেঙ ঝেনের নেতৃত্বে পাঁচজনের গ্রুপ এই সমালোচনাকে অন্যায্য বলে রিপোর্ট পেশ করে। জিয়াং কিঙ এবং ইয়াও ওয়েনউইয়ান উ হান এবং পেঙ ঝেনের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ চালিয়ে যান। এটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা।

এরপর বড়ো ও মাঝারি শহরগুলোতে ছাত্র ও যুবকদের ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু হয়। মাওয়ের সরাসরি সমর্থন পেয়ে এই কার্যকলাপ লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুবকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লিউ শাও চি এবং তেঙ শিয়াও পিঙ-এর নির্দেশে পার্টি জুন মাসের গোড়ায় নতুন করে আরও ওয়ার্ক টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাডারদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়া এই পাল্টা ওয়ার্ক টিমগুলো বিরোধী-রেডগার্ড হিসেবে মাঠে নেমে পড়ে। মাও সেতুঙ সরাসরি এর বিরোধিতা করেন এবং ১৮ আগস্ট তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে দশ লক্ষ রেডগার্ডের সঙ্গে মিলিত হন। ৮ আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১১তম প্লেনামে 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত' গৃহীত হয়। এতে বলা হয়, "যদিও বুর্জোয়াদের উৎখাত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা এখনও জনগণকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য শোষকশ্রেণীর পুরনো চিন্তা, সংস্কৃতি, রীতি ও অভ্যাসগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের মনের ওপর দখল নিতে চাইছে এবং ফিরে আসতে চাইছে। সর্বহারাকে এর ঠিক বিপরীত কাজ করতে হবে: তাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সরাসরি মোকাবিলা করতে হবে এবং গোটা সমাজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য নতুন চিন্তা, সংস্কৃতি, রীতি ও অভ্যাসগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হল, যারা পুঁজিবাদের পথ নিচ্ছে সেই কর্তৃত্বে থাকা লোকেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাদের চূর্ণ করা; প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শিক্ষায়তন 'কর্তৃপক্ষ'-এর সমালোচনা করা এবং তাদের পরিত্যাগ করা; বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং সমস্ত অন্যান্য শোষকশ্রেণীকে সমালোচনা ও বর্জন করা; এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে খাপ খায় না এমন শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প এবং উপরিকাঠামোর সমস্ত অন্য অংশের রূপান্তর ঘটানো, যাতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও সংহতিকে ত্বরান্বিত করা যায়।"

এই প্লেনামে প্রশ্ন উঠেছিল, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কি গ্রামাঞ্চলে ও কমিউন স্তরের চলমান 'সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে? সিদ্ধান্ত হয়, না তা করা হবে না। বড়ো ও মাঝারি শহরের সংস্কৃতি ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলির এবং নেতৃস্থানীয় পার্টি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে বুর্জোয়া ক্ষমতাধরদের শুদ্ধিকরণের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত হবে। কিন্তু এইবছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শহর ছাপিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চলেও রেডগার্ডরা ছড়িয়ে পড়ল।

শহরে পড়তে এসেছে এমন রেডগার্ড যুবক গ্রামে ফিরে গিয়ে মাওয়ের উদ্ধৃতি উচ্চারণ করে তার বাবা-মায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করল; উৎসাহের বশে বাড়ির বংশগত ফলক, ধূপদানি এবং ধর্মীয় মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলল; বৃদ্ধ চাষি ও মহিলাদের সঙ্গে কুসংস্কার ও ধর্ম নিয়ে সভা করে তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দূর করার চেষ্টা করল।

পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, যারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ওপরতলার 'বুর্জোয়া ক্ষমতাধর'দের নিকেশ করার কাজে ব্যবহার করতে চাইছিল, তাদের এসব পছন্দ হল না। বিশেষত, এতে উৎপাদন মার খাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তারা বলল : 'বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরো, উৎপাদনকে এগিয়ে নাও'। এমনকী ১৪ সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীতে বলা হল, '... পিকিং এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে রেডগার্ডরা কাউন্টি স্তরের নিচে কমিউন বা উৎপাদন ব্রিগেড স্তরের গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে বিপ্লবী অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান অথবা বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে না'; 'সমস্ত শহুরে রেডগার্ড এবং বিপ্লবী ছাত্র ও শিক্ষক যাদের পাওয়া যাচ্ছে, তাদের গ্রামাঞ্চলে সংগঠিতভাবে শ্রমে অংশ নেওয়া এবং শরৎকালীন চাষের কাজে সহায়তা করার জন্য পাঠানো হোক; কাউন্টি স্তরের নিচে যেসব ক্যাডারদের ঊর্ধ্বতন পার্টি কমিটি অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ করা হয়েছে, জনগণ সরাসরি তাদের দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবে না;' ইত্যাদি।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মাও এবং তাঁর সাথীরা সদর দপ্তরে কামান দাগতে চাইলেও আঞ্চলিক ক্ষমতাধরদের উৎখাত করতে চাইছিলেন না, অন্তত সেই মুহূর্তেই। তাছাড়া, মাত্র কয়েক বছর আগের (গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড পর্বে) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতিও তাঁদের ছিল। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয়, সেই সতর্কতাও তাঁদের ছিল। তাঁরা এমনও বলেছিলেন, চাষিদের ক্ষেত্রে অবিলম্বে 'চার পুরনো'-কে ধ্বংস করার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করা হোক, সেগুলো আবার চাষের কাজের হালকা মরসুমে শুরু করা যাবে।

কিন্তু রেডগার্ড নামক 'দৈত্য' বোতল থেকে বেরিয়ে পড়ায় তাকে ফের বোতলবন্দি করা মুশকিল হয়ে পড়ল। ১০ অক্টোবর লিন পিয়াও প্রকাশ্যে লিউ শাও চি এবং তেঙ শিয়াও পিঙ-কে 'পুঁজিবাদী পথিক' বলে আক্রমণ করলেন। লিউ-কে বন্দী করা হল। পেঙ তেহুয়াই-কে পিকিংয়ে এনে

জনসমক্ষে হেনস্থা করা হল। সমস্ত রেডগার্ডদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় পিকিংয়ে আসার জন্য ডাক দেওয়া হল। এই আবহাওয়ায় যেমন প্রতিষ্ঠান–বিরোধী নানান র‍্যাডিকাল গণসংগঠন গড়ে উঠল; আবার একই সঙ্গে লাল পতাকা কাঁধে নিয়ে নানান মতলবের গোষ্ঠীর জন্ম হল।

সারা দেশে এবার প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য উৎপাদন মার খাওয়ার ভয় কেটে গেল। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৬ কেন্দ্রীয় কমিটি 'গ্রামাঞ্চলে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব'–এর ওপর নির্দেশিকা প্রকাশ করল। এতে বলা হল, 'চাষি, বিশেষত গরিব ও নিম্ন মধ্য চাষিরা নিজেদের শিক্ষিত করে মুক্ত হয়ে, নিজেদের বিপ্লবের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ঘরের মালিক হোক'; যেসব চাষিরা সমালোচনা করছে, বড়ো হরফের পোস্টার লিখছে, কমিউন, উৎপাদন ব্রিগেড ও গ্রামীণ ক্ষমতাধরদের পক্ষ থেকে তাদের আক্রমণ করা, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া কিংবা ওয়ার্ক পয়েন্ট কেটে নেওয়া নিষেধ; বাইরে থেকে ওয়ার্ক টিম পাঠিয়ে বিপ্লবী জনতার বড়ো প্রস্ফুটন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না; গ্রামীণ মিড্‌ল স্কুলের ছাত্রদের ছুটি ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হল, যাতে তারা রেডগার্ড বাহিনী সংগঠিত করে বিপ্লবী অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করতে পারে এবং চার পুরনোকে ধ্বংস করতে পারে। নেতৃত্বদায়ী ক্যাডারদের ছেলেমেয়েদের (কমিউন, ব্রিগেড ও উৎপাদন টিম স্তরের) গ্রামীণ রেডগার্ড সংগঠনের দায়িত্বশীল পদে রাখা চলবে না। গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিরা হবে এর মেরুদণ্ড; পার্টি কমিটির বদলে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব কমিটি'–কে রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন উপকরণ হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হল।

১৯৬৭ সালের জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাসে লিন পিয়াও, জিয়াং কিঙ ইত্যাদিদের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক ভয়াবহ ঝোড়ো বিপ্লবের চেহারা নিল। গ্রামাঞ্চলেও বিক্ষুব্ধ ও অন্যান্য স্বার্থের নতুন গজিয়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলো গ্রামের সমস্ত ধরনের ক্ষমতাধরদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করল। আবার এই পরিবেশে চাষিদের মধ্যেও নৈরাজ্য এবং শ্রমের কাজে ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁক বেড়ে গেল। ১৯৬৭ সালের প্রথমার্ধ জুড়ে চাষিদের একাংশ (বিশেষত শহরতলী এলাকাগুলো থেকে) শহরে চলে আসতে থাকল। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে এবার সেই স্রোত ঠেকানোর চেষ্টায় নামতে হল।

তবে গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল এবং বিচিত্র সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ল। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীতেও আর কাজ হচ্ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষে বসন্তকালীন বীজ রোয়ার সময় চলে এল। পার্টির পক্ষ থেকে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের কাছে খোলা চিঠি পাঠানো হল : "এখনও পর্যন্ত উৎপাদন টিমের ক্যাডারদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি, তাদের কেবল উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা করা, শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করা এবং কমিউন ও উৎপাদন ব্রিগেডের দ্বারা যেসব নির্দিষ্ট কাজের পরিকল্পনা করা হয়, সেগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে তাদের কোনভাবেই 'ক্ষমতাধর' বলা যায় না। সাধারণ ক্যাডারদের ক্ষেত্রেও (মূল ক্যাডারদের থেকে তারা আলাদা) এই বিশেষণ প্রযোজ্য নয়। খুব সামান্য কিছু 'পাঁচ ধরনের লোক', যারা উৎপাদন ব্রিগেড এবং উৎপাদন টিমে ঢুকে পড়ে ক্যাডার বা সাধারণ ক্যাডার হয়ে উঠেছে, এদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা, এমনকী সংগ্রামের টার্গেট করে তোলা উচিত নয়।" এসত্ত্বেও গ্রামের রাজনৈতিক গোলমাল কমল না। এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল, জানুয়ারি বিপ্লবের ঝোড়ো পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সংবাদপত্র, টেলি–যোগাযোগ হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, না হয় দখল হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, বহু গ্রাম প্রত্যন্ত হওয়ার কারণেও নিয়মিত সরকারি যোগাযোগ ছিল না।

এবার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হতে হল। জানুয়ারির শেষে মাও সেতুঙ কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের সভায় বললেন, "প্রাথমিকভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ দরকার ছিল না। এখন শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে, সেনাবাহিনীকে বামপন্থীদের সমর্থন করতে হবে।" কিন্তু মুশকিল হল, পিএলএ (পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি)–র সঙ্গে ক্যাডারদের সম্পর্কই ভালো ছিল, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তার ওপর বিপ্লবী জনতা কোন নির্দেশ মানতে চায় না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষগুলো ওপরে ওপরে শান্ত করা সম্ভব হলেও, তার অন্তর্নিহিত যেসব সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, তার সমাধান করা পিএলএ–র পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে দক্ষিণ চীনের গ্রামাঞ্চল থেকে বেআইনিভাবে হঙকঙে পালিয়ে যাওয়ার স্রোত ১৯৬৭–র দ্বিতীয়ার্ধে তীব্রতর হয়ে উঠল।

পিএলএ–র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল বটে, কিন্তু তা ছিল সাময়িক। ১৯৬৮–র বসন্তে আবার রেডগার্ড বিদ্রোহ জেগে উঠল। জুন মাসে নৃশংসভাবে তাকে দমন করা হল। এর আগে মাও বলেছিলেন, জনগণের ওপর পিএলএ অস্ত্র ব্যবহার করবে না। কিন্তু এবার গ্রাম–শহর সর্বত্রই 'আইন–শৃংখলা' রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা হল। কিন্তু ততক্ষণে চীনের গ্রামাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে গেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তার সংগ্রাম–সমালোচনা–রূপান্তর প্রক্রিয়ার গণ–হাতিয়ার নিয়ে।

এবার পার্টি–নেতৃত্ব বুঝতে পারল, এই বিদ্রোহী যুবসমাজকে যদি কোন কাজের মধ্যে নিয়োজিত না করা যায়, তাহলে চীনের পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৬৮ মাও সেতুঙের নির্দেশে পিপল্‌স ডেলি পত্রিকায় লেখা হল একটি প্রবন্ধ : 'আমাদেরও দুটো হাত আছে, আমরা অলসভাবে শহরে ঘুরে বেড়াব না'। এতে মাওকে উদ্ধৃত করা হয় : "লেখাপড়া জানা যুবকদের অবশ্যই গ্রামে যেতে হবে এবং গ্রামের দারিদ্রের মধ্যে বাস করে শিক্ষা নিতে হবে, এটা প্রয়োজন।"

কাই লিজিয়ান নামে এক যুবতী রেডগার্ড শানসি প্রদেশের এক পার্বত্য গ্রামে বাকি জীবনের জন্য চলে যায়। কাইয়ের সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এক হাজারের বেশি ছাত্র তাকে অনুসরণ করে। এরপর ঘোষণা করা হয়, কলেজে সরাসরি শ্রমিক ও চাষিদের মধ্য থেকে ভর্তি করা হবে। ১৯৬৮ সালের মধ্যেই ২০ লক্ষ ছাত্র–যুবক শহর ছেড়ে চলে যায়। ২২ ডিসেম্বর পিপল্‌স ডেলি–তে মাও ফের বলেন, "শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের দ্বারা পুনর্শিক্ষিত হওয়া খুবই জরুরি। ক্যাডার ও শহরের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের — যারা জুনিয়র বা সিনিয়র হাই স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে — বুঝিয়ে গ্রামাঞ্চলে পাঠাক। চলো যাওয়া যাক। গ্রামাঞ্চলের কমরেডরা তাদের অভিনন্দন জানাবে।" পরের বছর ১৯৬৯ সালে আরও ২০ লক্ষ ছাত্র গ্রামে চলে যায়।

এই 'গ্রামে চলো' অভিযানে যেমন সামাজিক আদর্শের অনুপ্রেরণা ছিল, আবার একটা পরোক্ষ চাপও তৈরি হয়েছিল যুবসমাজের ওপর। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৮ পর্যন্ত বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছিল না, কাজ পাচ্ছিল না। ১৯৭১–এ পার্টি গ্রাম থেকে ফেরা যুবকদের কাজের ব্যবস্থা করছিল। প্রতিবছর যেভাবে দশ লক্ষের বেশি যুবক কার্যত শহর থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল, একটা বিক্ষোভ ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। মাও সেতুঙও বিষয়টা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৭৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির পরীক্ষা পুনরায় চালু হওয়াতে এইসব বিতাড়িত যুবকেরা শহরে ফেরার চেষ্টা করে। যুবকেরা সরকারের কাছে তাদের দুর্গতির কথা নানাভাবে জানাতে শুরু করে। অবশেষে ১অক্টোবর ১৯৮০ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিতাড়ন–প্রথা বন্ধ করে। যুবকেরা শহরে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসার সুযোগ পায়। ১৯৬২ সালে পার্টি প্রথম জাতীয় স্তরে যুবকদের 'গ্রামে চলো' অভিযান

শুরু করেছিল। ১৯৭০–এর দশকের শেষে দেখা গেল, এই পর্যায় জুড়ে ১.২ থেকে ১.৮ কোটি যুবক শহর ছেড়ে গ্রামে গেছে।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮০–র দশক পর্যন্ত হুকৌও ব্যবস্থা (রেসিডেন্সিয়াল পারমিট সিস্টেম)–র কড়াকড়ির জন্য চাষি পরিবারের সদস্যরা উপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারত না। অন্যত্র গেলে সেখানকার পারমিট না থাকলে তাদের পুলিশ ধরত। পুলিশ না ধরলেও শহরে তারা খাবারদাবার কিনতে পারত না, কারণ সেখানে প্রধান খাদ্যশস্য পেতে গেলে রেশন–কুপন লাগত। ১৯৪৯–এর বিপ্লবের আগে চাষিরা অবস্থাপন্ন জেলায় চাষের ব্যস্ত মরসুমে খাটতে যেত। পরবর্তীকালে গ্রামে জমি চাষের অনুপযুক্ত হলেও দুরবস্থা থেকে বাঁচার জন্য কাজের খোঁজে অন্যত্র যাওয়া যেত না। ফলে সচ্ছল এবং দরিদ্র জেলা, অঞ্চল ও গ্রামের মধ্যে জীবনযাত্রার ফারাক বেড়েই চলেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় শহর ও গ্রামের এতদিনকার স্থিতাবস্থায় এমন একটা নাড়াঘাটা করে দিল, যা চীনা চাষিসমাজের মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তিস্বার্থের ঝোঁক এবং ফাটল গজিয়ে তুলল। সাধারণভাবে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিরা এর মাঝে কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা নিতে পারল না। এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ রেডগার্ড যুবকদের গ্রামে পাঠানোর বিষয়টি যুক্ত হয়ে চীনাসমাজে এমন এক রসায়ন সৃষ্টি হল, সম্ভবত তারই ফলশ্রুতিতে চীন ১৯৮০–র দশক থেকে এক চমকপ্রদ মোড় নিতে শুরু করল।

সূত্র :

১. **The Transformation of the Rural China, Jonathan Unger**
২. **The Cultural Revolution in the Countryside: Anatomy of a Limited Rebellion, Richard Baum**
৩. **Out of the Crucible: Literary Works about the Rusticated Youth, Zuoya Cao**

হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল
ঊ হানের নাটক নিয়ে নাটক

তমাল ভৌমিক

হাই রুই (বা হাই জুই) চীনের এক জনপ্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র। মিঙ রাজাদের সময়ে গুয়াঙদঙ প্রদেশে কুইয়ংশান জেলার অধিবাসী ছিলেন হাই রুই। হাই রুই (১৫১৪–৮৭) হুই জাতির লোক। ইংশিয়ানের সামরিক গভর্নর হিসেবে, রাজস্ব মন্ত্রকের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এবং চুনান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিভিন্ন পদে কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও স্পষ্ট বক্তা। এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল এবং তাদের সুখদুঃখের সাথী। সৎ অফিসার হওয়ার ফলে তিনি বিচারের অন্যায্য সিদ্ধান্ত উল্টে দিতেন; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির পক্ষে দাঁড়াতেন; কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমি ফেরত দেওয়ার জন্য জমিদারদের বাধ্য করতেন এবং কৃষকদের ওপর চাপানো রাজস্ব ও করের বোঝা লাঘব করতেন। সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের ওপর তাঁর সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখানোর জন্য হাই রুইয়ের খ্যাতি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। তাঁকে পদচ্যুত করে জেলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

১৯৫৯ সালের জুলাই–আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির অষ্টম প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয় লুশানে। এই লুশান সম্মেলনের আগে মাও সেতুঙ বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করতে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ১৯৫৮–র শুরু থেকে যে 'গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার সরেজমিন তদন্ত করতে গ্রামগুলিকে নিজের চোখে দেখা। এই সময়ে তিনি হুনানে গিয়ে হাই রুইকে নিয়ে একটা অপেরা (চীনা যাত্রা ঢঙের নাটক) দেখেন। অপেরার নাম ছিল সোং সি পাই। এই অপেরায় দেখানো হয়েছিল, কেমনভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ভুলভাবে এক মহিলাকে খুনের দায়ে শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন হাই রুই।

গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ডের সফলতা নিয়ে সঠিক রিপোর্ট আসছে না, এমন একটা সন্দেহ সেই সময় মাওয়ের মনে দেখা দিয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, সাহস করে সত্যি কথা না বলার একটা বাজে ঝোঁক অনেক সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তিনি হাই রুইয়ের সাহসিকতা ও সত্যবাদিতার প্রশংসা করেন এবং হাই রুইয়ের কাছ থেকে সত্য কথা বলা শেখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। ১৯৫৯ সালের ২–৫ এপ্রিল অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম প্লেনারি সেশন অনুষ্ঠিত হয় সাংহাইয়ে। সেখানেই মাও তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'হাই রুইয়ের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হও'।

১৯৫৯–র লুশান সম্মেলন হয়েছিল ২ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট। সেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পেং তে হুয়াই গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড কর্মসূচির 'বাম' বিচ্যুতিগুলো নিয়ে একটা সমালোচনামূলক চিঠি দেন মাও সেতুঙকে। মাও এটাকে পেং–এর 'বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা' ও 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ' বলে পাল্টা সমালোচনা করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা পেং তে হুয়াই সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে 'পার্টি বিরোধী চক্রান্ত'–এর অভিযোগ আনেন। এই ঘটনার একমাস পরে, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পেং তে হুয়াইকে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই পদে লিন পিয়াও–কে বসানো হয়।

১৯৫৯–র গোড়ার দিকে সম্ভবত লিউ শাও চি–র মদতে গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ডের কিছু সমালোচনাকে সামনে আসতে দেওয়া হয়েছিল। গ্রেট লীপ–এর জন্য যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু অর্থনীতিবিদ তার সমালোচনা করেছিল। কৃষক ও শৌখিন লেখকদের সাহিত্য চর্চারও কিছু সমালোচনা করেছিল পেশাজীবী লেখকেরা। এগুলোর প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৫৯–এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। পেং তে হুয়াই বরখাস্ত হওয়ার পর 'হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল' — এই নামে একটা নাটক লেখেন ঊ হান। ঊ হান ছিলেন মিঙ রাজবংশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসের অধ্যাপক। এই নাটক লেখার সময় তিনি ছিলেন পিকিঙয়ের মেয়র। ঘটনাক্রমে হাই রুইকে বরখাস্ত করার এই নাটক রূপক হিসেবে পেং তে হুয়াইকে বরখাস্ত করার সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়। নাটকটা ঊ হান লেখা শেষ করেন ১৯৬০–এর দশকের শেষের দিকে। কিন্তু কয়েকবার মঞ্চস্থ হওয়ার পরই ১৯৬১–র বসন্তে সেনসর করে নাটকটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ঊ হান মন্তব্য করেন, 'হাই রুইকে বরখাস্ত করা হল'।

ঊ হানের এই নাটক এক সাধু ব্যক্তিকে নিয়ে শুরু, যিনি মহৎ উদ্দেশ্যে ইয়ুয়ান রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন রাজত্বের লোভে নয়, অত্যাচার বন্ধ করার জন্য। সেই ব্যক্তির নাম ছিল চিয়া চিঙ। এই চিয়া চিঙের হাতে নতুন যে রাজবংশ তৈরি হয়, তার নাম ছিল মিঙ। পরে রাজা বিলাসে মত্ত হয়ে পড়লে হাই রুই নামে

এক সৎ অফিসার তাঁর সমালোচনা করে জেলে যান। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আবার কাজে নিযুক্ত হন। যেসব অসৎ অফিসার অত্যাচারী জমিদারদের পক্ষ নিয়ে গরিব চাষিদের বিপক্ষে কাজ করছিল, এবার হাই রুই কৃষকদের পক্ষ নিয়ে সেইসব দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। আবার পদচ্যুত হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর লড়াই চলতে থাকে।

উ হানের এই নাটকের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ নেমে আসে ১৯৬৫ সালের ১০ নভেম্বর এবং এই ঘটনাকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর্দা উন্মোচন বলে ধরা হয়। সে বিষয়ে যাওয়ার আগে উ হান সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলে নেওয়া যাক। উ হান নিজের দুই ছেলেকে পড়াতে গিয়ে প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী তথা বই লেখার তাগিদ অনুভব করেন। তখন চীনে বাচ্চাদের ভালো বই ছিল না। তিনি চীনের অ্যাকাডেমিশিয়াকে ভালো শিশু পাঠ্যপুস্তক লিখতে অনুরোধ করেন। আর নাটক লেখা সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল, তিনি জীবনে এই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক লেখার কথা ভেবেছিলেন। কারণ 'বর্তমানকে পথ দেখানোর জন্য অতীতকে ব্যবহার করাই হোক, অতীতের সাহায্যে বর্তমানকে বিদ্রুপ করাই হোক, যা খারাপ সেটার নিন্দা করে আঙুল তুলে ভালোটাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হোক অথবা নৈতিক তাৎপর্যের কতকগুলো দিককে জোর দিয়ে দেখানোর জন্যই হোক, প্রত্যেক ঐতিহাসিক নাটকের একটা সৃষ্টিশীল দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে আর একই সঙ্গে থাকে এক প্রেক্ষাপট, যে সময়ে এটা রচিত হচ্ছে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে।' উ হান আরও বলেছিলেন, প্রথম যখন তিনি 'চেয়ারম্যান চিয়াং কাই শেক দীর্ঘজীবী হোক'–এর এলাকা থেকে 'চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোক'–এর মুক্ত এলাকায় ঢুকেছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, 'এখন কেন আর এইসব দীর্ঘজীবী হোক নিয়ে মাথাব্যথা করব'। তিনি মাওয়ের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ মাও একপেশে চোখে সামন্ততন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদকে দেখেননি। মাও ব্যক্তিগতভাবে উ হানের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে 'শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে' থেকে সরে আসতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পরে উ হানের মতে 'আমাদের পুরনো সবই খারাপ, সব খারাপ থেকে আমাদের জন্ম, আমাদের ইতিহাস আজই শুরু হচ্ছে — এমন নয়। আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে অনেক মহান মানুষ ছিলেন ... ঐতিহাসিক চরিত্রকে শুধুমাত্র শ্রেণীভিত্তিতে বিচার করা যায় না। মানুষ পাল্টাতে পারে — এটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবসময়েই প্রযোজ্য। ...'

১৯৬৬ সালের ১০ নভেম্বর। সাংহাইয়ের 'ওয়েনহুই' পত্রিকায় "নতুন ঐতিহাসিক অপেরা 'হাই রুইকে বরখাস্ত করা হল' সম্পর্কে মন্তব্য" শীর্ষক ইয়াও ওয়েন ইউয়ানের লেখা এক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে শুরু হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ডের ত্রুটি–বিচ্যুতি, সেগুলো সংশোধনের উপায় এবং উপস্থিত সমস্যাগুলো নিয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ১৯৬২ সাল থেকে পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছিল। জিয়াং কুইং (মাদাম চিয়াং চিং) বহুবারই মাওকে প্রস্তাব দেন, 'হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল' নাটক নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং সমালোচনা করা উচিত। প্রথমদিকে মাও একমত না হলেও পরে এই প্রস্তাবে রাজি হন। ১৯৬৬–র গোড়া থেকেই ইয়াও ওয়েন ইউয়ানের ওই প্রবন্ধ প্রকাশের পরিকল্পনা চালাচ্ছিলেন জিয়াং কুইং ও ক্যাঙ চুন কিয়াও। কিন্তু মাও সেতুঙ ছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরোর কাউকে তা জানতে দেওয়া হয়নি। ইয়াও তাঁর প্রবন্ধে উ হানের নাম ধরে সমালোচনা করেন। 'হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল' নাটকে দুটো স্লোগান ছিল : চাষিরা সম্রাটের কাছে দাবি জানাচ্ছে, 'চাষের জমি ফিরিয়ে দাও' এবং 'অন্যায় শাস্তি ফিরিয়ে নাও'। ইয়াও এ দুইয়ের সমালোচনা করে বলেন, 'চাষের জমি ফিরিয়ে দাও' দাবি কৃষিক্ষেত্রে একলা চলার ঝোঁকের পক্ষে যায় এবং 'অন্যায় শাস্তি ফিরিয়ে নাও' দাবি সঠিক আইনি সিদ্ধান্ত পাল্টে দেওয়ার অভ্যাস শুরু করবে এবং 'এগুলো হচ্ছে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের লড়াইয়ের বর্শামুখ'। অতএব সিদ্ধান্ত হল, 'হাই রুইকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হল' একটা 'বিষঝাড়'। মাও সেতুঙ ইয়াওয়ের প্রবন্ধটি প্রকাশের অনুমতি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত সংবাদপত্র ও পত্রিকায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রবন্ধের বক্তব্য একটা গণসমালোচনার আকার নিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করল।

মজার কথা হল, ওই নাটকে উক্ত দুই স্লোগানের সঙ্গে তৃতীয় একটা স্লোগানও ছিল : 'বদমাইসদের দূরে হটাও'। এই স্লোগানটাকে নিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কান্ডারিরা কাটাছেঁড়া করেননি। অথচ উ হানের মতে এই স্লোগানটা ছিল বৈপ্লবিক। কারণ আগের স্লোগান দুটো সংস্কারের কর্মসূচির কথা বলছিল। বরং 'বদমাইসদের দূরে হটাও' স্লোগান ক্ষমতায় যারা আছে তাদের সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল, যা ছিল এক বড়ো পরিবর্তনের স্লোগান। তিনি মনে করেছিলেন, একজন সচেতন ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি নাটকে শুধু সংস্কারের কথা বলতে পারেন না।

তথ্যসূত্র :

১. **Hai Jui Dismissed from Office by Wu Han, Translated by C C Huang, Asian Studies at Hawai 7, The University Press of Hawai**

২. **History of the CPC (1919-1990), Foreign Language Press, Beijing, 1991**

খবর দিন

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

প্রতিমাসের ১ ও ১৬ তারিখ এই পাক্ষিক সংবাদপত্র সংগ্রহ করুন।

ডাকযোগে সারা বছরের গ্রাহক–চাঁদা চল্লিশ টাকা।

খবর নিন

সরাসরি যোগাযোগ

প্রতি মঙ্গলবার, দুপুর তিনটে থেকে সাতটা, বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম স্ট্রীট, কলকাতা ৯

ডাক যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com.

চীন নিয়ে আড্ডা

বর্ণালী চন্দ (সংক্ষেপে ব.চ.) কোয়াংচোউ-এর সাউথ চায়না নর্মাল ইউনিভার্সিটিতে চীন এবং ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত জাতক এবং চীনা সাহিত্যে তার গ্রহণ নিয়ে তাঁর গবেষণার কাজের অঙ্গ হিসেবে চীনে গিয়েছিলেন। তিনি চীনা ভাষা কিছুটা জানতেন, ওখানে গিয়ে চীনা ভাষার এক বছরের একটা কোর্স করেন। আগস্ট ২০০৮ থেকে আগস্ট ২০০৯ একবছর তিনি ওদেশে ছিলেন। আমরা মন্থন সাময়িকীর পক্ষ থেকে ওঁর সঙ্গে শনিবার ১২ জুন ২০১০ আড্ডায় বসেছিলাম। তারই অংশ এখানে ছাপা হল।

প্রশ্ন : তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের ঘটনা নিয়ে চীনের ছেলেমেয়েরা কী বলে? ওরা ঘটনাটা জানে?

ব.চ. : তিয়েনআনমেনের ঘটনাটা যদি কেউ চীনে বসে গুগল্-এ সার্চ করে, কিচ্ছু ইনফর্মেশন পাবে না। চীনের ছেলেমেয়েদের একটা বিশাল অংশ এ সম্পর্কে কিছু জানে না। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা সমস্ত জ্ঞান-মাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। না ইতিহাস বইয়ে ... না ইন্টারনেটে ... কোনখানে এর কোনও চিহ্ন নেই।

প্রশ্ন : মিডিয়া থেকে কতটা জানা যায়?

ব.চ. : ভারতে ভারতীয় মিডিয়া আছে, জাপানে জাপানি মিডিয়া আছে, কোরিয়াতে কোরিয়ান মিডিয়া আছে — সবকটাই আমেরিকান মিডিয়া নয়, এটা ওরা মানতে চায় না। চীনে চাইনিজ মিডিয়া রয়েছে, কিন্তু সেটা ওদের খবরাখবর থেকে অনেকটাই বঞ্চিত করে। আমি শুনেছিলাম এরকম একটা ব্যাপার হয়, কিন্তু যখন দেখলাম এটা সত্যি, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম এবং ক্ষুব্ধও হয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি ওখানে কোথায় ছিলেন?

ব.চ. : আমি ছিলাম ক্যান্টনে, মান্দারিনে বলে কোয়াংচোউ। এটা দক্ষিণ চীনে, হঙকঙ থেকে খুব কাছে কুয়াংতং (গুয়াঙদঙ) প্রদেশের রাজধানী। কোয়াংচোউ চীনে তৃতীয় বৃহত্তম শহর, অর্থনৈতিক দিক থেকে সাংহাইয়ের পরেই এর গুরুত্ব। আমি চীনে গেছিলাম মান্দারিন শিখে — এটা মোটামুটি সারা চীনে চলে। আর কোয়াংচোউতে চলে কোয়াংচোউ হুয়া — হুয়া মানে ভাষা। আমরা ওটাকে জানি ক্যান্টনিজ বলে। এই ভাষাটি বেশ কঠিন। চীনে একটা বড়ো সংখ্যক মানুষ এই ক্যান্টনিজ ভাষায় কথা বলে, শুধু কোয়াংতংয়ে নয়, পাশের কুইলিং প্রভৃতি জায়গাতেও লোকে বলে। চীনের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা এটা। ক্যান্টনের লোকেরা চীনের প্রধান ভাষা মান্দারিন বলে খুব খারাপভাবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ওদের একটা অভ্যেস হল, ডাকলে একগাল হেসে প্রথমেই বলবে, নি হাও — তারপরেই বলবে, 'ছি ল মা!', মানে তুমি খেয়েছ তো? কিন্তু কুয়াংতংয়ের লোকেরা এই 'ছ'টা বলতে পারে না। ওরা বলে, 'সি ল মা!' এই সি মানে মান্দারিনে মরে যাওয়া। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াবে, তুমি মরে গেছ তো! এর উত্তরে বলতে হয়, এখনও খাইনি। আমরা ইয়ার্কি করে বলতাম, এখনও মরে যাইনি।

প্রশ্ন : চীনের সাধারণের মুখের ভাষাটা কী? লেখার ক্ষেত্রে আমরা 'ক্যারেক্টার' বলে একটা জিনিস পেয়েছি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় 'বিগ-ক্যারেক্টার পোস্টার' লেখা হয়েছিল ...

ব.চ. : ওদেশে মান্দারিন সবাইকেই শিখতে হয়, কারণ ওটার নামই হল পু তং হুয়া, মানে 'সর্বসাধারণের ভাষা'। ওটাতে একবছরে চীনে থেকে আমি তিন হাজারের মতো হরফ (ক্যারেক্টার) শিখেছিলাম। পদ্ধতিটা আমাদের এখানে যেমন শেখানো হয়, তার থেকে একেবারে আলাদা। আপনাকে প্রথমে শুনতে হবে। আমি একটু তাড়াতাড়িই শিখেছিলাম, তিনমাসের মধ্যে। কথা বলাটা শিখেছিলাম। কারণ আমার কথা বলা শেখাটা জরুরি ছিল। কথা না বলতে পারলে তো খেতেই পারব না। প্রথম এক সপ্তাহ তো খেতেই পারিনি, জানতামই না কী বলব। বন্ধুদের বলতাম লিখে দিতে। সেই লেখা দোকানে দিতাম, একটা জিনিস লিখে দিতাম, আরেক জিনিস দিত। এখানেই সংস্কৃতির পার্থক্য। আমি চেয়েছিলাম, সবজি দেওয়া হোক, আমি ভেজ খাব, নন-ভেজ খাব না। কিন্তু ওরা দিতে পারত না। এই ভেজ-নন ভেজ ধারণাটাই ওখানে নেই। মানে ভেজ-নন ভেজ ধারণাটা আমাদের থেকে আলাদা। সুপের মধ্যে নুড্‌লস আর সবুজ সবজি-পাতা দিয়ে একটা ভেজ ডিশ। কিন্তু হয়ত ওই সুপটা মূলত বিফ-স্টু, যা গরুর হাড় ফুটিয়ে তৈরি করা হয়। কিন্তু ওটাকে ভেজ বা নিরামিষ হিসেবে দেখা হল। ভেজ বলতে গেলে ওদের স্পেশ্যলি বলতে হয় স্যু। কিন্তু স্যু বললে যেটা দিয়ে যাবে, সেটা পুরোপুরি সেদ্ধ করা একটা সবজি। পুরো সবুজ। খুব কম সেদ্ধ করা। প্রায় কাঁচা — যা ভারতীয় মেনুতে সম্পূর্ণ বর্জিত। ওরা যেহেতু দ্রব্যগুণটাকে ধরে রাখতে চায়, তাই বেশি সেদ্ধ তো করেই না, জলের মধ্যে তেল দিয়ে তারপর এটাকে সেদ্ধ করে। ফলে সবুজ রঙটা থাকে।

পর্ক বা শুয়োরের মাংস হল অন্যতম প্রধান খাবার। আমরা অনেক খাবারের দোকানে খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। অবশেষে 'লানচৌ লা মিয়েন' (লা মিয়েন হল নুড্‌লস, যা দু'হাতে টেনে বানানো হয়)-এর দোকান খুঁজে পাওয়ার পর আর অন্য কোনখানে খুব একটা খেতাম না। এই দোকানগুলো সারা চীনেই দেখা যাবে। পশ্চিম চীনের লানচৌ প্রদেশের মুসলমানেরা চালায় এগুলো। খাবারগুলো খুবই উৎকৃষ্ট। অনেকরকম নুড্‌লস পাওয়া যায়। পশ্চিম চীনের খাবার বলে মধ্য এশিয়া আর চীনা খাবারের এক অসাধারণ মেলবন্ধন দেখা যেত। সুস্বাদু কাবাব আর নানরুটিও পাওয়া যায়। ধর্মের কারণে ওদের ওখানে খেলে পর্ক থেকে বাঁচা যেত। আমি পর্কটা খেতে পারতাম না, ভীষণ খারাপ খেতে লাগত। ওই পর্কের ঝোলের চেহারা ছিল, আমাদের এক সিনিয়র গবেষকের বর্ণনায়, ঘর মোছার ন্যাতা, যখন পচে যায়, তার যে গন্ধটা হয় এবং তাকে জলে চোবালে যেরকম দেখতে হয় জলটা, সেরকম হল এই স্যুপ। ওদের নিজস্ব মশলা আছে। জিরে গুঁড়ো আমি মুসলিম দোকানে ব্যবহার করতে দেখেছি। কাঁচালঙ্কা দেখিনি একদম। একটা শুকনো লঙ্কার আচার মতো আছে, শুকনো লঙ্কা বেটে, তার মধ্যে তেল আর তিল দিয়ে। আদাও থাকে। এটাকে লাচিয়াও বলে। লা মানে ঝাল। ওটা নুডলসের মধ্যে ছড়িয়ে নিতে হয় খাবার সময়। খেতে বেশ ভালো। তিল অনেক খাবারে ব্যবহার করা হয় এবং খাবারে একটা আলাদা ফ্লেভার নিয়ে আসে এটা।

প্রশ্ন : কীভাবে মান্দারিন শেখা যায়?

ব.চ. : ওখানে ভাষা শেখার পদ্ধতিটা হল, শুনে শুনে শেখা এবং চলাফেরা করার জন্য যেটুকু দরকার, সেটাই প্রথম সেমেস্টারে শিখে নেওয়া। আর মান্দারিনের হরফ লেখা খুব কঠিন। একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ওই নিয়ম থেকে বেরিয়ে গেলে হরফটার বিশুদ্ধতা রক্ষা হল না। ওই নিয়মেই অবশ্য লিখতে সবচেয়ে সুবিধা। অন্য কোনভাবে লিখতে অসুবিধা। মানুষের হাতের একটা সাধারণ স্ট্রোক থাকে, সেটাকে ব্যবহার করেই হরফ লেখার নিয়ম তৈরি।

প্রশ্ন : মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বোধ কীরকম?

ব.চ. : সংস্কৃতির মধ্যে একধরনের বৈজ্ঞানিক বোধ অবশ্যই আছে, যা খুবই যৌক্তিক। ওদের প্রতিদিনের খাবার খুব স্বাস্থ্যকর। উল্টোপাল্টা জিনিস খায় না। স্বাস্থ্য সচেতনতা ওদের জিনের মধ্যেই রয়েছে। খাওয়ার সঙ্গে ওরা সবুজ চা খায়। ওদের খাবার খুবই তৈলাক্ত, কিন্তু সেই তেলটা খাদ্যের মধ্যে ঢোকে না, ছাড়া থাকে। ওই তেলটা হজম করবার জন্য ওরা সবুজ চা খায় খাবারের

সাথে। ওরা সবসময় একটা ফ্লাক্স রাখে সঙ্গে, তাতে সবুজ চা থাকে।

আমি ওদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোনও নাড়াচাড়া দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি একজন বন্ধুকে, মেয়েটা গ্রাম থেকে আসা। ও কিন্তু বলেছে, আমার কোনও ধর্মবিশ্বাস নেই। আমার বাবা–ঠাকুর্দা একসময় বৌদ্ধধর্ম মানতেন, তারপর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর আর অতখানি ধর্ম–বিশ্বাস নেই। ওরা পূর্বপুরুষের উপাসনা করে। সেই পূর্বপুরুষদের ফলক নিয়ে উপাসনা করে নতুন বছরে, যাকে আমরা স্প্রিং ফেস্টিভাল বলে জানি। জানুয়ারি মাসের ২৫–২৬ তারিখ নাগাদ পালন করা হয়। এসময় গোটা পরিবারটা ঐক্যবদ্ধ হয়। আমি একটা গ্রামে গিয়েছিলাম, এই প্রদেশেই। সেখানে একটা ঘরে ফায়ার–প্লেসের মতো দেখতে জায়গা আছে। সেই বেদীর সামনে এবং ওপরে ধূপ–ধুনো দেওয়া হয় নিয়মিত। ওরা বসন্ত উৎসবে ওটার সামনে বসে খাওয়া–দাওয়া করে। নতুন বছরের উৎসবের একটা বড়ো দিক হল খাওয়া, কারণ একসাথে খাওয়ার মধ্যে দিয়ে একে অন্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালোভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। এখন নিউক্লিয়ার পরিবার হয়ে গেছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, কিন্তু ওই উৎসবে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়। একটা টেবিলে একটা পাত্র থেকে সবাই তুলে নেবে। সাধারণত মা মাসিরা রান্না করে। সমাজটা পিতৃতান্ত্রিক। ওই বসন্ত উৎসবের চীনা নাম ছুনচিয়ে।

প্রশ্ন : যাতায়াতের ব্যবস্থাটা কীরকম?

ব.চ. : চীনে অনেক ধরনের ট্রেন আছে। একটা ট্রেন, সেটা সর্বসাধারণের জন্য। ট্রেনটাকে বলে ফু কোয়াই। ফু মানে ধীরগতি। আমরা বুঝিনি সেটা কতটা আস্তে যাবে। ১৫৩০ কিমি দূরত্ব, সেটা আটতিরিশ ঘন্টায় যাচ্ছে ট্রেনটা। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মতো থেমে থেমে যাচ্ছিল। কিন্তু যারা ট্রেনে চেপেছিল, তাদের কারোর মুখে কোনও বিরক্তি, ক্ষোভ, দ্বেষ নেই। অনেকক্ষণ থেমে আছে। যাওয়ার কথা তিরিশ ঘন্টায়, সেটা আটতিরিশ ঘন্টা লাগাল, কিন্তু কোনও ক্ষোভ অথবা বিরক্তি নেই। মেনে নিচ্ছে। সহ্যক্ষমতা অপরিসীম। আমরা তখন চাইনিজ জানি, তাতে যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করছি, কিন্তু তারা নির্বিকার। তারা খেয়ে যাচ্ছে। অনেকেই একটা বোরা মতন নিয়ে ওঠে। সারাটাক্ষণ বসে বসে ওটা থেকে জিনিস বার করে খাচ্ছে, যা আমাদের কাছে যথেষ্টই অপরীক্ষিত, অদ্ভুত। বেশিরভাগ দেখলাম নন–ভেজ খাবার। চিকেনের বা মাছের আচার বলা যেতে পারে। আমরা ও রসে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ট্রেনে বাঙ্ক আছে। তাতে জিনিসপত্র রাখবে। সেখানে শোওয়ার নিয়ম নেই। তো আটতিরিশ ঘন্টা জার্নিতে আমরা একটু শোবো তো! আমাদেরধ্যে একজন বাঙ্কে উঠে পড়েছি, একজন মহিলা গার্ড বারবার বলছে, একটু নেমে যান। ট্রেনে বেশিরভাগ কর্মী মহিলা। অতীব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী গম্ভীর মহিলাদের দেখলে তাদের আদেশ পালন করতে বাধ্য। অন্য যাত্রীদের কেউই নিজেরা কিন্তু বাঙ্কারে শোবে না। কেউ নিয়ম ভাঙছে না। এটা আমাদের সঙ্গে ওদের পার্থক্য।

প্রশ্ন : ভিখারি আছে? হকার?

ব.চ. : পুলিশ এখানে ভিখারি আর হকারদের তাড়া করে। ওখানে প্রচুর হকার আছে। কারণ বেকারত্ব আছে। শহরে আমাদের গড়িয়াহাটের মতো অমন খোলা বাজারও আছে। খাবার বিক্রি করে আমাদের ইউনিভার্সিটির সামনে। আমার ইউনিভার্সিটির নাম সাউথ চায়না নর্মাল ইউনিভার্সিটি। কেউ একজন ইনফর্মার থাকে, সে এসে খবর দেয় যে পুলিশ আসছে, মুহূর্তের মধ্যে সব হকার উধাও। হকাররা খাবার বিক্রি করে, জামাকাপড় বিক্রি করে, বই বিক্রি করে, সাজার জিনিসপত্র বিক্রি করে। হকাররা আমাদের এখানকার মতোই জিনিস নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করে। একইরকমভাবে ওখানেও দরাদরি করতে হয়। ট্রেনে হকার নেই। ট্রেনে ট্রেন কর্তৃপক্ষের থেকে খাবার দেয়। হকাররা দূর থেকে আসে। কখনও অন্য প্রদেশ থেকে। তারপর থাকে হয়ত ঘর ভাড়া নিয়ে। ওদের যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম, কোথা থেকে এসেছ? ওরা হাসত খুব। ইয়ার্কি মারত। আমার মনে হয়েছে চীনারা বেশ চাপা স্বভাবের। ওদের থেকে ব্যক্তিগত কথা জানা বেশ শক্ত। শুধু রাষ্ট্রের কথায় এটা হয় না, যে সবাই চাপা। এটা ওদের জীবনের একটা অঙ্গ। একটা ছেলে খুব সস্তায় খুব সুন্দর সুন্দর সব জিনিস বিক্রি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী কর? কারণ ওখানে অনেকে পড়তে পড়তে হকারি করে। তো আমি জিজ্ঞেস করলে ওরা খুব অবাক হত — একটা ফরেনার চাইনিজে কথা বলছে। তো ছেলেটা আমাকে উল্টে জিজ্ঞেস করছে, তুমি ভালো চাইনিজ বলতে পার, কোত্থেকে শিখেছ ...। অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। আমি জিজ্ঞেস করছি তখন, তুমি কী পড়েছ, কতদূর পড়াশুনো করেছ? তখন সে খুব হাসছে, বলছে, আমি গ্র্যাজুয়েট। আমি জিজ্ঞেস করছি, কোথা থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছ? বলছে পেইতা থেকে, পিকিং ইউনিভার্সিটি থেকে। তখনই বুঝতে পেরেছি, ইয়ার্কি মারছে। নিজেকে নিয়েই একটা মজা করা। হয়ত স্কুল পাশ করেছে। তবে ওদের কোথা থেকে এসেছ জিজ্ঞেস করলে বলে, ওদের দেশ কোথায়, গ্রাম কোথায়। বেশিরভাগ লোক ছাউচিং বলে একটা গ্রাম আছে সেখান থেকে আসে এই কোয়াংচোউতে। গ্রাম থেকে অনেকেই রোজগারের আশায় চলে আসে শহরে।

প্রশ্ন : চীনের এসইজেড তো বিখ্যাত —

ব.চ. : অর্থনৈতিক অঞ্চল এসইজেডগুলোতে আমি যাইনি। কিন্তু আমি দেখেছি, শহরে ম্যাসাজ সেন্টারগুলো একটা বড়ো জায়গা। এগুলো প্রচুর পরিমাণে আছে। খুব সস্তায় ওরা খুব উন্নত মানের সার্ভিস দেয় এবং ভীষণ যত্ন করে। নিয়ে যাবে। বসাবে। চা দেবে। ফুল বডি ম্যাসাজ করে দেবে ৫০ ইউয়ানের মধ্যে। এক ঘন্টা ধরে। খুব বৈজ্ঞানিক। ওরা বিভিন্ন ধরনের ম্যাসাজ করায়। ফুট ম্যাসাজও আছে,। আমার কাঁধের একটা সমস্যার জন্য আমি গিয়েছিলাম। আমার দু'বছরের ব্যথা, ৪৫ মিনিটের একটা ম্যাসাজ করল, আমি আট ন'মাস সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। এই ম্যাসাজ সেন্টারে যারা ম্যাসাজ করে, তারা খুব প্রশিক্ষিত। এই মেয়েরা খুব কথা বলে। এটাও তাদের কাজের অঙ্গ। ওদের একটা আড্ডার প্রবণতা আছে। দুটো চাইনিজ এক জায়গায় এলেই প্রচণ্ড আড্ডা দেবে। বিদেশিদের সামনে অবশ্য চাপা। হয়তো বা স্বভাবগতভাবে অথবা ইংরেজি জানে না বলে। এরা বেশিরভাগই কথা বলত, কেমন আছো, বাবা–মা কেমন আছে, টাকা পয়সা না থাকার জন্য এখানে এসে কাজ করা — এইসব নিয়ে। তো এদের আমি জিজ্ঞেস করতাম, কোথা থেকে এসেছো? তো এরা বেশিরভাগই আসত পাশের প্রদেশ কুইলিং থেকে। আমার মনে হয় এটা লিগাল নয়। আমার বিশ্বাস সে অত্যন্ত কম বেতনে ওখানে কাজ করে। কিন্তু তার ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

চাইনিজ টেক্সট বইতে লেখা থাকে, প্রত্যেক চাইনিজের বাড়িতে একটি মাত্র করে সন্তান। কিন্তু গ্রামে চার পাঁচটা সন্তান আছে অনেকের। এমন হওয়ার কারণ আছে, তাদের কাজ করে খেতে হবে তো!

প্রশ্ন : কর্মরত মেয়েদের চোখে পড়েনি?

ব.চ. : মেয়েরা অনেকেই শহরে কাজ করতে আসে, নিজের বিয়ের টাকাটা জোগাড়ের জন্য। তবে ওখানে মেয়ে এবং ছেলেদের কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সম্মানেও কোনও পার্থক্য নেই। হোম ভায়োলেন্স আছে। তবে সঠিক অর্থে গোটা দেশটা মেয়েরাই চালাচ্ছে। ছোটো দোকান থেকে শুরু করে কাস্টমসের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে মেয়েরা রয়েছে। আমি এটাও দেখেছি, মেয়ে বাস ড্রাইভার। সবচেয়ে খুশি হয়েছি এটা দেখে যে বাসে কোথাও লেখা নেই, লেডিজকে জায়গা ছেড়ে দিন। শুধু লেখা আছে বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা এবং অক্ষমদের জায়গা দিন। আমি ঘন্টা দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে

আছি, একটা লোক উঠে বসতে দিল না। তবে বয়স্কদের বসতে দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে নেই। ওখানে একটা সমান ভাবে দেখার প্রবণতা আছে। ম্যাসাজ সেন্টারগুলোতে অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশি। হকারিতে বিবাহিত মেয়েরাও আছে। অনেক ম্যাসাজ সেন্টারগুলি আসলে সেক্স শপ। দু'রকমই আছে। আপনাকে বুঝে যেতে হবে। এবং এই সেক্স শপগুলো খুব ওপেন। অনেকটা আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্সও আছে।

প্রশ্ন : চীনের ছাত্রদের জীবন কাছ থেকে দেখেছেন?

ব.চ. : হ্যাঁ খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত পরিশ্রমী জীবন ছাত্র-ছাত্রীদের। সকাল ৮টা থেকে ক্লাস শুরু হয় ... মাঝে মাঝে তা রাত ৮টা অবধিও চলে। মাঝে ব্রেক অবশ্য আছে। কিন্তু ছাত্ররা ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটায়। তাদের ডর্মিটরিতে থাকাটাও খুবই আলাদা। যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু না হলে ওভাবে থাকা যায় না। একটা মাঝারি আকারের ঘরে আটজনের জন্য বেড, ওপরে-নিচে করে অ্যাডজাস্ট করা। ছোট্ট বিছানার পাশে একটা পড়ার টেবিল বড়ো জোর রাখতে পারো। তার মধ্যেই তোমার পুরো সংসার। দেখেছি কী সুন্দর করে সবাই অ্যাডজাস্ট করে নেয় তাতেই। ওখানেই বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকে। এমন কষ্ট করাতে এরা বেশ অভ্যস্ত।

প্রশ্ন : আমেরিকার প্রভাব কীরকম?

ব.চ. : এরা প্রচণ্ড আমেরিকাকে অনুসরণ করে। তাদের স্টাইল, ফ্যাশন, মানসিকতা — সব দিক থেকেই। অন্যদিকে আমেরিকা হচ্ছে সবচাইতে বড়ো শত্রু। ফলে একটা কনফিউশনও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কার্যত এরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং বিদেশি সংস্কৃতিকে মিলিয়ে নিয়ে একটা ভারসাম্য রেখেছে। এরা জানে কোথায় অ্যাগ্রেসিভ হতে হয় আর কোথায় অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্ন : ওখানকার মানষের দেশবোধ কীরকম?

ব.চ. : এতদিন ওখানে থেকে যা সবিশেষ লক্ষ্য করার মতো তা হল, দেশের নীতি-নিয়মের ওপর সাধারণ মানুষের নিষ্ঠা এবং নিজেদের মধ্যে একতাবোধ। এত জায়গা ঘুরে আমার মনে হল, দেশের মানুষেরা দেশকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে। বিদেশের কাছে দেশের মুখ যাতে উজ্জ্বল থাকে সেই ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। রাস্তা পরিষ্কার করার সামান্য কর্মীটিকে পর্যন্ত আমি অসাধারণ নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। ভেবেছি ... ইস্! আমাদের দেশের মানুষ যদি এভাবে একটু ভাবত! হয়তো বা আমরা একে ন্যাশনালিজম বলব। কিন্তু এত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার নিজের গরিব দেশের কথা খুব মনে হত। এই সুবিশাল দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যা নিয়ে যে দেশ এভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তার কথা একটু আলাদা করে ভাবতেই হবে আমাদের।

চিঠিপত্র

২. বিষয় : ফলতা এসইজেড

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে ও ২০০৫ সালের জুলাই-আগস্টে ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে ফলতা এসইজেড নিয়ে ব্যাসদেব দাশগুপ্তের একটি লেখা ছাপা হয়েছে মার্চ-এপ্রিল ২০১০-এর মন্থন সাময়িকীতে। ২০০৯-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার মন্থন সাময়িকীতে এসইজেড বিষয়ে এবং বিশেষত ফলতা এসইজেড বিষয়ে অনেকগুলো লেখা ছাপা হয়েছিল। সেগুলোর তুলনায় ব্যাসদেববাবুর দেওয়া তথ্যগুলো পুরনো এবং সেই কারণেই তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অনেক ফারাক দেখা যাচ্ছে। যেমন, ব্যাসদেববাবুর লেখায়, "এসইজেডের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এখানে রয়েছে ৯০টি চালু ইউনিট। আমাদের সমীক্ষার সময় আমরা কেবল ৩০-৩৫টি চালু ইউনিট দেখতে পেয়েছি। ... জোনের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলি হল প্লাস্টিক এবং টেক্সটাইল, সামান্য কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটও রয়েছে। শিল্পগুলি বেশিরভাগই শ্রম-নিবিড়। এক বিপুল সস্তা শ্রমের উপস্থিতির জন্যই মনে হয় এই জোনটি গড়ে উঠেছে ..." ইত্যাদি সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যাসদেববাবু যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার মধ্যে একটা হল, "শ্রম পরিবেশের ভয়াবহ দুর্দশা, কাজের অনিশ্চয়তা এবং চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের দৃষ্টান্ত এই ফলতা; শিল্পায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাণিজ্যমুখী উন্নয়নের এক ব্যর্থতার প্রতীক এখানকার এসইজেড, যা শিল্পপতিদের শিল্প থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।" তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, ওখানে শ্রমিকদের শিল্প থেকে কৃষিতে এক বিপরীতমুখী যাত্রা দেখা যাচ্ছে। নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯-এর 'মন্থন'-এ জিতেন নন্দী, পার্থ কয়াল, শুভেন্দু বক্সী ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফলতা এসইজেড নিয়ে লেখায় ছবিটা একরকম নয়। জিতেনের লেখায় এসইজেডের দেওয়া হিসেবে কারখানার সংখ্যা ১০১ এবং আরও ৩০টা তৈরি হতে চলেছে ইত্যাদিতে এসইজেড ব্যবসার খানিকটা বৃদ্ধির ছবি পাওয়া যায়। এসইজেডের কাজের পরিবেশের ভয়াবহতা ও চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের ব্যাপারে অবশ্য সবাই একমত। পার্থ কয়াল ও শুভেন্দু বক্সীর লেখা পড়ে মনে হয়েছিল যে স্থানীয় পুরুষ শ্রমিকেরা কম কাজ পেলেও স্থানীয় মহিলা শ্রমিকেরা এবং দূর থেকে আসা শ্রমিকেরা ফলতা এসইজেডের গেটে এখনও ভিড় করে, অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষের স্রোত শুধু শিল্প থেকে কৃষির দিকে একমুখী নয়, উল্টোধারাও আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফারাক হল, ব্যাসদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যায়; পার্থবাবু দেখাচ্ছেন, "২০০৫-০৬ সাল থেকে ২০০৮-০৯ মাত্র তিন বছরে ফলতা সেজ থেকে রপ্তানি ৫২৪.৯৫ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৬১.২৬ কোটি টাকা। তিন বছরে প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছে। ... সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে প্লাস্টিক, রাবার ও সিনথেটিক কারখানাগুলোর রপ্তানি, যা ২০০৫-০৬ সালে ৩৩.১৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়ছে ৮৮.৮৯ কোটি, বৃদ্ধি আড়াই গুণেরও বেশি। ...উন্নয়নের গল্পটা এখানেই ফাঁস হয়ে যায়। অদক্ষ শ্রম সস্তায় লুটে নেওয়াতেই বেশি মুনাফা।"

অতএব, মনে হয়, এই মুনাফার টানই পুঁজিকে এসইজেড বাড়ানোর দিকেই ঠেলবে। যতক্ষণ শ্রমিকের সহ্যশক্তি ভেঙে না পড়ছে, ততক্ষণ সেখানে শ্রমের মজুরি ও কাজের পরিবেশ খারাপই থাকবে। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে ঠিকাদারির অশুভ সংযোগও থাকবে। কারখানার বাইরের বেকার শ্রমিকদের ভিড়ও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সম্প্রতি বাজার অর্থনীতির সংকট ও শ্রমিকদের আন্দোলন অবশ্য এসজেডের স্বর্গরাজ্য চীনেও এসইজেডকে টেকসই নয় বলেই প্রমাণিত করেছে।

২০ জুন ২০১০

অমিতাভ সেন
কলকাতা

৩. বিষয় : জোরজারির প্রতিরোধ

বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে চারিদিকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও আগ্রাসন শুরু হয়েছে দেশের ভিতর, তার আঘাত মূলত দেশের আমাদের মতো সাধারণ নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষের ওপর এসে পড়ছে। আজকে এই লালগড় সহ বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের জল-জমি-জঙ্গল যেভাবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার লিজের নামে বেচে দিচ্ছে তা অত্যন্ত অন্যায়। হাজার হাজার বছর ধরে যারা এই জল-জমি-জঙ্গলকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেও বুকে আগলে রেখেছে আজ সরকার বাহাদুররা তাদের সেখান থেকে

বিতাড়িত করতে চাইছে, উদ্দেশ্য একটাই সেই অঞ্চলের মাটির বুক চিরে সম্পদ লুঠ করার অধিকার দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া। আর এর জন্য শুধু যে আদিবাসী মানুষরা তাদের জল-জমি-জঙ্গল হারাচ্ছে না, তার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সমগ্র খেটে খাওয়া দীন-দরিদ্রমানুষ। এর জন্যই তারা আজ প্রতিবাদ করছে। তারা যখন বাচাঁর জন্য বাচাঁর স্বপক্ষে আর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে; তখন রাষ্ট্র তার সৈন্যদল, রাজ্যপুলিশ ও সিপিএম হার্মাদ সালওয়া জুডুম সহ বিভিন্ন বাহিনী নামিয়ে এইসব আদিবাসী মানুষদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। যখন কিছু মানুষজন এই অত্যাচার চোখে দেখার পর এই সমস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করছে, তখন তাদের মাওবাদী তক্মা লাগিয়ে মিথ্যে মিথ্যে বিভিন্ন মামলায় রাষ্ট্রের তৈরি মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন প্রয়োগ করে তাদের আটক করছে ।

এই হচ্ছে আমাদের নতুন করে রাষ্ট্র-রাজ্য মিলিয়ে যৌথভাবে উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকৃত মুখ। আমার মনে হয় আমরা যারা এখন চুপ করে বসে আছি, নিজেকে এবং নিজের কর্মসংস্থানের রক্ষা করার তাগিদে পা বাড়াতে ভয় পাচ্ছে তারাও কিন্তু আদৌ নিরাপদ জায়গায় নেই। রাষ্ট্র যে নিয়মনীতি চালু করেছে এবং রাজ্যসরকারগুলি একে দু'হাত তুলে সমর্থন জানাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কেউ নিরাপদে নেই। কেউ কি খুব জোর দিয়ে এক্ষুনি বলতে পারি যে আমি নিরাপদে আছি? কাল সকালে আমায় উঠে শুনতে হতে পারে যে আমার চাকরিটি আর নেই। অথবা আমার ছোটো ব্যবসাটা হারিয়ে গেছে। তাই অনর্থক মিছে মিছে ভয় পেয়ে বসে থাকাটা বোকামি। অন্যের জন্য নাই হোক, নিজের জন্য তো একটা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই একটা পথ একটা দিক। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে রাজ্যে জেলায় জেলায় প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি হচ্ছে; কিছু কিছু মানুষ হাঁটি হাঁটি পা পা করে সেইসব মঞ্চে হাজির হচ্ছে, এই কারণে যে তারাও বুঝতে পারছে যে তাদের জন্যও কত বড়ো বিপদ অপেক্ষা করছে। জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় সমগ্র রাষ্ট্র যেমন চলছে, তেমনি সেই পয়সার একটা অংশ খরচ হয় দেশের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে মিলিটারি—পুলিশের পিছনে। মিলিটারি ভিন্ন রাষ্ট্রের শত্রুদের মোকাবিলায় নিযুক্ত থাকে , আর রাজ্য পুলিশ থাকে সাধারণ মানুষের দেশের মধ্যে নিরাপত্তা দেবার জন্য। তাদের যা কর্তব্য সেগুলো না করে তারা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে, গুলি চালায়, ধর্ষণ করে, নানান শারীরিক নির্যাতন করে মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের নামে। বিদেশি শত্রুর বদলে তারা দেশের আধাসামরিক বাহিনীগুলি আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যে রাজ্যে দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাচ্ছে, ঘর পোড়াচ্ছে, মহিলাদের শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করছে; এমনকী তারা বৃদ্ধ-শিশুদেরও রেহাই দেয়নি। এই আমাদের রাজ্যে জঙ্গলমহলে মাওবাদী ধরার নামে গ্রামে ঢুকে তারা পানীয় জলের কূঁয়োতে তারা পায়খানা করে জল নষ্ট করে দেয়। এটা কত বড়ো নির্মম অত্যাচার। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই অত্যাচার থেকে। মাওবাদী জুজু দেখিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে পি চিদম্বরম সাধারণ মানুষকে যে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন সেটা আর কতদিন? যখন সাধারণ মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় — তখন কজনকে গ্রেপ্তার করবে রাষ্ট্র? মিথ্যে মামলা দিয়ে, মাওবাদী তক্মা দিয়ে। সকল মানুষের কাছে আমি একান্তভাবে আবেদন জানাচ্ছি যে আজ যেখানে যে প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি হচ্ছে সেখানে হাজির হোন, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

৬।৭।২০১০

বাপী মণ্ডল
নোনাডাঙা, কলকাতা

অঞ্জন ঘোষ স্মরণে

জন্ম : ১৩ মে ১৯৫১ মৃত্যু : ৫ জুন ২০১০

আমরা তখন অন্য অর্থে। সত্তরের দশকের শুরু। অন্য অর্থ বাংলাভাষায় অর্থনীতির পত্রিকা। অঞ্জন এল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের স্নাতক ছাত্র তখন জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের স্নাতকউত্তর ছাত্র। অন্য বিষয়ের গবেষক ছাত্ররা এসে যাওয়ায় অন্য অর্থ বদলে হল বাংলাভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের পত্রিকা। অঞ্জন সেই বদলে। অন্য অর্থর সমীক্ষায়, আলোচনায়, লেখায়, প্রকাশনায় অঞ্জন উপস্থিত।

আমি যখন গবেষণায় দিল্লিতে তখন অঞ্জনের আশ্রয়ে। জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে রোজই ছাত্রদের আড্ডায় বিষয়ে রাজনীতি আসবেই। অঞ্জনের মত থাকবেই। অঞ্জন তখন নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক, সমালোচক। মাও সেতুঙ চিন্তাধারার অনুশীলক। তখন ভারত ব্যাপী রেল ধর্মঘট। রেল ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রদের উদ্যোগে অঞ্জন সংগঠক।

অঞ্জন তখন দিল্লিতে আইআইটিতে শিক্ষক। আমার গবেষণার কাজে আমি দিল্লিতে অঞ্জনের সঙ্গে। ঘর ভর্তি বই পত্রপত্রিকা। অঞ্জন নানা ধরনের পত্রিকা সংগ্রহ করত, পড়ত, আমাদের বলত। আমাদের দরকারি যে কোন বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে সবচেয়ে কাছের মানুষ অঞ্জন। কোন বইতে, কোন পত্রিকায় কার লেখায় পেয়ে যাব অঞ্জন বলে দেবে আমরা নিশ্চিত।

অঞ্জন আর আমি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে গবেষক সতীর্থ।

অঞ্জনের শেষ কর্মস্থল সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা। পড়াতে যেত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বলতে যেত দেশে বিদেশে কত জায়গায়। এত লেখাপড়ার কাজের জায়গা। এতে নিজেকে আটকে রাখার লোক নয় অঞ্জন।

আরও অনেক অনেক জায়গায় অঞ্জন। বন্দীমুক্তি আন্দোলন, অধিকার আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন, ক্ষমতাসীন দলের, দলেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। অঞ্জন থাকবে। মিছিল, জমায়েত, অবস্থান, ধরনা, আলোচনা, সভা, ইস্তেহারে স্বাক্ষর অঞ্জন থাকবেই।

অঞ্জন চলে গেল ৫ জুন। অঞ্জনের ভাবনা, কাজ, লেখা, সমর্থন, থেকে গেল।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666